সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

মাসিক
জাগো মুজাহিদ

পাঠকের কলাম

ওদের তুনিরের দ্বিতীয় তীর এবং একটি ঐতিহাসিক মহা সমাবেশ

২৯ শে জুলাই ঢাকা বাসী প্রত্যক্ষ করেছে এক ঐতিহাসিক মহা সমাবেশ। লাখো জনতায় ঢল নেমেছিল রাজধানীর বুকে। কালেমা খচিত পতাকা ও জাতীয় পতাকা উড়িয়ে সারি সারি বাস ট্রাক ও লঞ্চ , ষ্টিমারে করে কিশোর থেকে শুরু করে সফেদ শশ্রু মন্ডিত বৃদ্ধরাও এসেছে ধর্মদ্রোহীদের শাস্তির দাবী জানাতে। সেই জনস্রোতের কেন্দ্র বিন্দু ছিল মানিক জানাতে। সেই জনস্রোতের কেন্দ্র বিন্দু ছিল মানিক মিয়া এভিনিও , মাঠ পরিণত হয়েছিল বিশাল জন সমুদ্রে। উত্তাল তরঙ্গের মত তারা আন্দোলিত হয়েছিল গাদ্দারদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহে। মুহু মুহু

শ্লোগানের ধ্বনীতে কেঁপে উঠেছিল তৎসংলগ্ন সংসদ ভবন আর কুচক্রীদের শুরু হয়েছিল হৃদকম্পন। বিক্ষিপ্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া পুরোপুরি সফল হয়েছিল দিনে সেই মহা সম্মেলন। ধর্ম প্রাণ মুসলমানের এই মহা মম্মেলন। ধর্ম প্রাণ মুসলমানের এই মহা মিলন সহ্য হয়নি শয়তানি চক্রের। বানচালের কোন প্রচেষ্টাই বাদ রাখেনি ওরা, বাঁধা সৃষ্টি করেছে লং মার্চ প্রস্তুতি পর্বের সকল ক্ষেত্রে। ছুরিকাহত করেছে তার নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবীদের। এর পরেও গতি শ্লথ হয়নি অকুতভয় সত্যাশ্রয়ী মর্দে মুমিনের। জনতার এই স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলন নস্যাৎ করতে বসে থাকেনি বিদেশীদের পা চাটা নীচু প্রাণীর দল। তাদের ভয়! যদি সম্মেলন সফল হয়, তখন বিদেশী প্রভুদের কি জবাব দেবে, যারা এদেরকে আনুগত্যের নামে গাদ্দারীর শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছে এই মর্মে যে, “মৌলবাদের নামে ইসলামকে সমুল উৎখাত করবে এই মুসলিম অধ্যুসিত বাংলাদেশ থেকে।“ তাই তারা তাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে প্রভূদের নজরানা কোটি কোটি ডলার হালাল করতে মুসলমানের এই গণজাগরণের ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিল। যার একটি অংশ ছিল লংমার্চ বানচাল করার চেষ্টায় ব্যস্ত কিন্তু তৌহিদী জনতা তাদের বেধে দেয়া হরতাল উপেক্ষা করে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যোগদান করেছে এই মহা সমাবেশে। এ পর্যায়ে ব্যর্থ

হয়ে ওরা মানিক মিয়া এভনিউতে পেতে ছিল এক মৃত্যু ফাঁদ। সেই নারকীয় তান্ডব থেকেও আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দাদের রক্ষা করেছেন। লংমার্চের সতর্ক প্রহরীরা ধরে ফেলেছে শক্তিশালী বোমা সহ তাদের চরদের আর এদের নিয়েই সূত্রপাত হয়েছিল সেই অপ্রীতিকর ঘটনার। এ ছাড়া সমাবেশ স্থল আর কোন অঘটন ঘটেনি। এখানেও যখন ব্যর্থ হল তখন লংমার্চ ফেরত যাত্রীদের বাস, ট্রাক থেকে নামিয়ে বেদম প্রহার করে তাদের হিংস্র প্রবৃত্তির লালসা পূর্ণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের টি, এস, সি চত্ত্বর সেই সন্ধায় রঞ্জিত হয়েছে ধর্মপ্রাণ মুসল্লীদের তপ্ত খুনে। এর পরেও তাদের আক্রোশ মেটেনি, আঘাত হেনেছে বাংলার বেরেলবী, মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক ঐতিহাসিক লংমার্চ নেতা জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের ওপর। এ হলো তাদের তুনিরের দ্বিতীয় তীর। যার প্রথমটা নিক্ষেপ করেছিল মুসলিম মিল্লাতের অতন্ত্র প্রহরী আফগান রনাঙ্গণের পরীক্ষিত মর্দে মুজাহিদ, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের দর্পন জাগো মুজাহিদ পত্রিকার সম্পাদক মুফতী আঃ হাই সাহেবকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সে তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে আঘাত হেনেছে তাদেরই বুকে। বিদীর্ন করতে পারেনি মুজাহিদের বক্ষ। ওরা আমাদের খতীবকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায় জড়িয়ে ফাসিতে ঝুলাতে চায়। কারারুদ্ধ করতে চায়

আমাদের সম্পাদককে। তারা ভেবেছে, এর পরে আমরা নীরব হয়ে যাব। খোদার কসম, নিশ্চুপ থাকবো না আমরা। ধর্মদ্রোহীতার অপরাধে ওদের প্রত্যেককে গাছের ডালে ঝুলাবো। এভাবেই সেই হত্যার বদলা নেবো যেমনি ভাবে তাদের পূর্ব সুরীরা আমাদের ত্রিশ লক্ষ আলেমকে-আলেম হওয়ার অপরাধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল।

মুহাম্মদ আবু জিহাদ
মালিবাগ জামিয়া, ঢাকা

মুসলিম বিশ্বে সংঘাত সৃষ্টির রহস্য

প্রশান্ত মহা সাগর তীরের ইন্দোনেশিয়া থেকে আটলান্টিক তীরের মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম শাসনের অধিনে রয়েছে শতাধিক দেশ। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্বে সংঘাত-সংঘর্ষ এবং আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা যায় তার শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম বিশ্বে ঘটছে। মায়ানমারের রোহিংগা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন, কাশ্মিরী স্বাধীনতাকামি মুসলমানদের ওপর ভারতীয় বর্বরতা, আফগান সংকট, তাজিকিস্তানের রুশ সমর্থিত কম্যূনিষ্ট কর্তৃক মুসুলিম নির্যাতন, ইরাকের ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ ও ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা দানে ইহুদী চক্রের ছলচাতুরী, ফিলিপিন্স সরকার কর্তৃক মিন্দানাওয়ের

মরো মুসলমানদের উপর সার্ব বর্বরতা ও স্বাধীনতা হরণ, বুলগেরি’য়া ও সাইপ্রাসে তুর্কি বংশদ্ভূত মুসলমানদের জোর করে খৃষ্টাণ বানানোর প্রচেষ্টা, সোমালিয়া সমস্যা, স্পেনিয় সাহারা সমস্যা এবং ত্রিনীদাদ ও বাগোর কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানদের ওপর খৃষ্টান পাদ্রিদের নির্যাতন। এইস সব অঞ্চলে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে প্রতিনিয়ত, তাদের জানমাল ও ইজ্জত লুন্ঠিত হচ্ছে। উপরের সমস্যাগুলো বাদে বর্তমান বিশ্বে আর কোন সমস্যা নেই বললে চলে। এখন দেখা যাক, এই সমস্যা এই স্মস্যা সংকুল দেশগুলো বাদে বাকি গুলো যাদের নিয়ন্ত্রণে সেই সব ইয়াহুদি, খৃস্টান নিজেদের সমস্যার ব্যাপারে যে ভুমিকা রাখছে মুসলমানদের ব্যপারে সেই ভুমিকা রাখছে কি? অবশ্যই না। একথা দিবা লোকের ন্যায় পরিস্কার যে, নামিবিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যায্য অধিকার সে দেশের জনগণ জাতিসংঘ বা পাশ্চত্য গোষ্ঠির সহযোগিতায় যত সহজে পেয়েছে সে ভাবে ফিলিস্তিন কিংবা বসনিয়ার মুসলমানরা পাচ্ছে না। যে ভাবে তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়াকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীণতা দেয়া হয়েছে সে ভাবে ককেশাশ মুসলমানদের, চেচিণ ইঙ্গশতিয়া, দাঘিস্তান ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোকে দেয়া হচ্ছে না। আর্মেনিয়া কর্তৃক আজার বাইজানের উপর অন্যায় আগ্রাসনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে

পারমানবিক ও রাশায়নিক অস্ত্র রাখার জন্য। এ অজুহাতে ইরাক ও পাকিস্তানের উপর যে ভাবে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে ঠিক সে ভাবে কি আগ্রাসি ইসরাইল কিংবা ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে ?

এই সব অন্যায় কর্মে ইয়াহুদি -খৃষ্টাণ - পৌত্তলিক চক্র এক ও অভিন্ন। তাদের প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘে তারাই ইচ্ছামত মুসলমানদের ওপর আগ্রাসন চালানোর লাইসেন্স , অবরোধ আরোপের পারমিট কিংবা ভাগ বাটোয়ারার দালালি এবং মুসলমানদের ন্যায্য প্রস্তাবের উপর ভেটো দেয়ার সোল এজেন্সির অধিকারি। কিন্তু এ অবস্থা আর চলতে দেওয়া ঠিক নয়। কেননা তারা মুসলিম জাতির কথা শুনলে ভয় পায় , এ জন্য ওরা আগের থেকে আরো শক্তি নিয়ে আদাজল খেয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধ উঠে পড়ে লেগেছে। এ উদ্দেশ্য সফল করতে মুসলিম মিল্লাতের জন্য আজ বেশি প্রয়োজন খাটি ঈমান , জিহাদ এবং শৃঙ্খলার সাথে একতাবদ্ধ হওয়া।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
গওহর ডাঙ্গা মাদ্রসা , গোপালগঞ্জ।

সম্পাদকীয়

দুনিয়াদার রাজনীতিকদের বালখিল্যতা।।
একটি বদনসীব জাতির সীমাহীন দূর্ভোগ

বাংলাদেশের এখন সরকার ও বিরোধীদলের মধ্য একটি অহেতুক দরকষাকষি চলছে। সরকার বলছে, নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে সাংবিধানিক নিয়মে যথাসময়ে নির্বাচন হওয়ার কথা। সরকার আবার নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্বাচন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং আরো সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করণে নতুন আইন-বিধি রচনারও পথ খোলা রেখে, বিরোধীদের সংসদে বসে আলাপ আলোচনা করে বিষয়টির সুরাহা করার আহবান জানাচ্ছে।

আর আওয়ামী লীগ, জামাত, জাতীয় পার্টি, গণফোরাম, ইসলামী ঐক্যজোট ইত্যাদি সকল দল মিলে বলছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন বিল সংসদে পাশ না করলে আমরা আর সংসদেই বসব না। এ জন্যে সংবিধান পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সংসদ ভেঙ্গে যেতে পারে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রহিত হয়ে অন্য কোন ধারার শাসন জাতির উপর চেপে বসতে পারে। সাংবিধানিক সংকটের সুযোগে বিদেশী অপশক্তির অযাচিত হস্তক্ষেপ হতে পারে। রাজনৈতিক সহিংসতা ও গৃহযুদ্ধ দেখা দিতে পারে। এ সবকিছুই আমরা কবুল করতে পারি কিন্তু নির্বাচিত সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়। জামাতে ইসলামীর কথা হলোঃ কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন আমীরে জামাত প্রফেসর গোলাম আযমের পদ্ধতি। বিগত ৯০ এর নির্বাচন এ পদ্ধতিতে হওয়ায়

নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয়েছে। এ পদ্ধতির বদৌলতেই আজ বিএনপি ক্ষমতায় আর আওয়ামীলীগ শক্তিশালী বিরোধী দল। অতএব পরীক্ষিত এ পদ্ধতিটি সবসময়ের জন্য গৃহীত হোক।

আর আওয়ামিলীগও কেয়ার টেকার সরকার দাবী করছে। বাংলার জমিনে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনদিন আওয়ামীলীগকে বাদ দিয়ে কোন নির্বাচন হবে না বলেও এর একজন বড় নেতা ঘোষণা দিয়েছেন। বর্তমান সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচনেই আওয়ামীলীগ অংশ নেবেনা বলে এর নেতারা পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য সংসদ ভেঙ্গে গেলেও লড়াই অব্যাহত রাখার পক্ষপাতি। এ দলের নেত্রী আবার বলেছেন, সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার দায়িত্ব বা দোষের বোঝা নিজের কাঁধে নিতে চাই না। কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে এখন তারা সরকার পতনের একদফা-একদাবীর আন্দোলনে নেমেছেন অথচ এরাই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনকে সুক্ষ্ম কারচুপির দোষে দুষ্ট করেছিলেন।

৮৬র সংসদ নির্বাচনে বিএনপি যায়নি। ওরা বলেছিলেন, এরশাদ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে যাবনা। ওরা যায়ওনি। তারা এরশাদকে হটিয়ে তবে ৯১-এর নির্বাচন করেছে এবং ক্ষমতায়ও রয়েছে। অবশ্য জামাতের সাথে সমঝোতা করে। আওয়ামীলীগ তথা সকল রাম-বাম ও

প্রগতি পন্থীদের চোখে যা ছিল সীমাহীন লজ্জাজনক ও মারাত্মক দোষের বিষয়।

আর আওয়ামীলীগ “এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাবেনা” এ ওয়াদা ভঙ্গ করে নির্বাচনে গিয়েছে এবং বিরোধী দলের আসনে বসে ১৮ মাসে সংসদের সুখানুভূতিও উপভোগ করেছে। এ সময় জামাতের দশজন সদস্য সংসদ সদস্যপদ থেকে ইস্তেফা দিলে সংসদ নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দেন।

এবার আওয়ামীলীগ তার সংসদ বর্জন যুদ্ধে জামাতের সাথে গলায় গলায় ভাব জমিয়ে, একই থালায় ভাত খাওয়া পর্যন্ত শুরু করেছে। একই টেবিলে বসে, একই মাইক্রফোনে কথা বলেছেন শেখ হাসিনা ও মাওলানা নিজামী। মধ্যে আছেন ব্যরিষ্টার মওদূদ সাহেব। আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, কথা, পন্থা এসব বুঝে উঠা খুবই কষ্টকর বলে দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এখন দম বন্ধ করে লেখা বা আলোচনা থামিয়ে রেখেছেন। কারণ তারা ভয় করছেন কোনদিন আবার শেখ হাসিনা কোন উপনির্বাচনে প্রফেসর গোলাম আযমকে পাশ করিয়ে এনে সংসদে বসিয়ে দেয়। কারণ, তাদের রীতিতে রাজপথে জামাতের সাথে কথাবলা বা দোস্তি করা সম্পূর্ণ হারাম কিন্তু সংসদের পবিত্রাঙ্গনে ওদের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি করা হালকা মকরূহও নয়। তবে খালেদা জিয়া যদি সরকার গঠনে ওদের সহায়তা নেন তাহলে এটা মহাপাপ বলে সাব্যস্ত হয়। এবং খালেদা জিয়া রাজাকার

হয়ে যান। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের শক্তিশালী এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মরহুম জিয়ার মুক্তিযোদ্ধাত্ব নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কি অদ্ভূত রাজনীতি! কত দুর্বোধ্য এদেশের রাজনীতিকদের মতি গতি!!

যে বিএনপি “বিসমিল্লাহ্” ব্যবহার করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যে দলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সহ কয়েকজন কেবিনেটমন্ত্রী এবং অসংখ্য এমপি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। বর্তমানে যে দলের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে রাজাকার বলা হচ্ছে। যে দলের মনোনীত ডেপুটি স্পীকার ১৯৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের নাগরিক এবং কূটনীতিক ছিলেন। যে দলের অন্ততঃ ১৭জন সংসদসদস্য ’৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিলেন বলে জানা যায়। সে দলের দায়িত্বশীল কিছু মূখ থেকে যখন আবার রাজাকার নির্মূলের বাণী শোনা যায়, তখন কি আশ্চার্যান্বিত না হয়ে পারা যায়?

ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যে দলের অঙ্গীকার, সে দলের শাসনামলে বাংলাদেশের তাওহীদী জনতার দাবী উপেক্ষা করে অপরাধী একজন উশৃংখল মহিলাকে আদালতের হাতে সোর্পদ না করে প্রধানমন্ত্রীর মতো সুরক্ষা ও প্রহরায় সরকারের লোকজন তাকে বিদেশে প্রেরণ করলো। এ সরকারের হাতেই

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ধ্বস নামছে। এ সরকারই লটারী ও জুয়াকে এ দেশের জাতীয় খেলার আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। এ সবও কি কম বিস্ময়ের??

প্রফেসর গোলাম আযমের বাসায় গিয়ে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস দেখা করলেন। তিনি একজন পাকিস্তানপন্থী লোক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের অখন্ডতা কামনা করতেন। এ জন্য তাকে আজো রাজাকার বলা হয়। আওয়ামীলীগ সংসদে এ রাষ্ট্রপতির ভাষণও বর্জন করে থাকে। আরো অনেক কিছু। কিন্তু বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী যিনি বিরোধীদলের প্রার্থী। তিনি যখন গোলাম আযমের কাজী অফিস লেনের বাসায় গিয়ে তার হাত ধরে দয়া চাইলেন, তখন কোন দোষ হলোনা। আওয়ামীলীগ তবুও তাকে সমর্থন দিতে থাকলো। কি বলা যায় এ দেশের রাজনীতিকদের সম্পর্কে?

যে স্বৈরাচারের পতনের জন্য তিন জোট হলো। জামাত আন্দোলনে আন্দোলনে ক্লান্ত হয়ে উঠলো। ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বায়তুল মোকাররমে বললেন, কিছু সময়ের জন্য ইসলামী আন্দোলন স্থিমিত করে হলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দলনকে বেগবান করে তুলতে জামাত বদ্ধপরিকর। এ স্বৈরাচারীদের সাথে এখন তিনজোটের দুইজোট

আর জামাতের কিছু মাত্র বিরোধ বা দূরত্বও বাকী নেই। এটাও কি কম বিস্ময়ের ব্যাপার?

যে সরকার নির্বাচনে তুমুল পর্যায়ের ডাকাতি, মিডিয়া কু, সন্ত্রাস এবং প্রিজাইডিং অফিসারদের দ্বারা বাধ্যতামূলক সীল মারানোর কাজ আদায় করেছে। যাদের সময় (বিশেষতঃ ’৮৮ সালে) দশ পার্সেন্ট ভোটার ভোটকেন্দ্রে না গেলেও শতকরা প্রায় ৯৯ দশমিক ৯ পার্সেন্ট ভোট কাষ্ট হয়ে যেতো। এদের মুখে এখন সুষ্ঠূ মনে হয়, এসব কি বাস্তব না কোন রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত কোন নাটকের নট নটিদের অভিনয়?

সুধী পাঠক! আমি এখানে এমন একটি অপ্রিয় আলোচনা শুরু করেছি যা দীর্ঘায়িত হলে বিষয়টা কেবল আবর্জনার স্তুপ ঘাতাঘাটির মতোই হবে। আমি এ প্রসঙ্গ এখানেই ক্ষ্যান্ত করতে চাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচিত সরকার, কোনটাই জাগো মুজাহিদের মতামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা, আমরা সবসময়ই এ সবকিছুর চেয়ে ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। আমাদের সামনে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ রয়েছে। আর তা হলো “ইসলাম”। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি, সংসদ, সংসদ, সংবিধান-সবকিছু যখন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মত, তাঁর রাসূলের নীতিতে এবং খেলাফতে রাশেদার চিহ্নিত সীমারেখা অনুসরণ করে চলবে তখন হয়তঃ কোন বির্তকে জাগো মুজাহিদের একটা মতামত থাকতে পারে। ‘ই

থেকে ছ ' পর্যন্ত আপাদমস্তক খোদাদ্রোহিতা , ইসলাম বিদ্বেষ আর নাপাকীতে ভরপূর একটি নীতিমালার পংকে নিমজ্জিত রাজনীতি আর এর চর্চাকারী দুনিয়াদার রাজনীতিকদের এহেন বালখিল্যতা প্রসঙ্গে আমাদের মন্তব্য করারও রুচি হয়না। আমরা কেবল এ বদনসীব জাতির সীমাহীন দুর্ভোগে ব্যথা অনুভব করেই চলেছি।

আর "আমূল পরিবর্তন " বা "সর্বাঙ্গীন একটি সফল বিপ্লব " এর জন্য জিহাদী আহবান জানাতে পারি। যে পরিবর্তনটির জন্য আমরা জীবন, যৌবন, চিন্তা , মেধা , অর্থ -সম্পদ , কর্মশক্তি ক্ষয় করে চলেছি। আমরা আমাদের সাথে কাতার বদ্ধ হয়ে চোখের পানি আর বুকের রক্ত প্রবাহিত করার মতো একদল মুজাহিদ চাই। আর গোটা জাতিকে তথা পৃথিবীর সকল মুসলমান মুজাহিদদের বলিঃ জাগো ! জাগো মুজাহিদ !! অধপতিত দাসোচিত জীবন থেকে মুক্তিলাভ করে ঈমান , সম্মান আর সাহসের জীবনের জন্য একবার জেগে উঠো !

জীবন পাথেয়

আল-কুরআনঃমুসলিম জাতিসত্ত্বার প্রাণ

হাকিমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব (রাহঃ)

সম্মানিত বন্ধুগণ! আজকের এদিনটি আমাদের সবার জন্য সীমাহীন আনন্দ ও খুশীর দিন। কারণ আজই আমাদের ক’জন শিশু-কিশোর কুরআনের হেফজ শেষ করে পাগড়ী ও সনদ লাভ করেছে। তাদের কচি হৃদয়ে আল্লাহ্র কালাম অঙ্কিত হয়েছে। আর কুরআনে পাক যার হৃদয় স্থান পাবে সে মহাসৌভাগ্যবান বইকি। যেহেতু আল্লাহ্ পাকের বরকতময় সত্বা ও তাঁর মহান গুণাবলী নুরদীপ্ত ও জ্যেতির্ময়। বান্দা হলো নিরেট এক অন্ধকার পিণ্ড স্বরূপ। আর এ আধারাচ্ছন্ন মানব জীবনে আল্লাহ্র নূর ও জ্যোতির প্রতিফলন মানবজাতির জন্য নিসন্দেহে এক মহা সৌভাগ্য ও বরকতের উৎস ধারা। গভীর মনে চিন্তা করলে বুঝে আসবে যে, এ কুরআন মানব জাতির আত্মিক জিবনী ও প্রাণ শক্তি বটে। জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করেছে এ কুরআন মানবধারায়। পৃথিবীর সকল জাতি গোষ্ঠীকে শিখিয়েছে সভ্যতা। অধপতিত আরব জাতিকে উন্নীত করেছে মানবতার স্বর্ণ শিখরে। এ বিষয়টির দিকে কুরআনে কারীমেরও ইঙ্গিত রয়েছেঃ

“হে নবী! আমি আপনার প্রতি আমার রুহ
তথা নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি।“ এরপর ইরশাদ হয়েছেঃ

‘ইতিপূর্বে আপনি কিতাব ও ঈমান কি
বিষয় তা জানতেন না।‘

এখানে কুরআন সম্পর্কে দু’টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম, এ কুরআন আল্লাহ্

প্রদত্ত রুহ ও প্রাণ। দ্বিতীয়ত এ কুরআন জ্ঞান ও পূর্ণতার আধার। যার মর্ম এই দাঁড়াই যে, ইলম ও জ্ঞানই মানব জীবনের পূর্ণতার মূল নিয়ামক। আমরা নিজস্ব পরিভাষায় বলে থাকি, রুহ এক অদৃশ্য শক্তি। শরীর তাঁর পরশেই সচল হয়। শরীরের নিজস্ব চলৎ শক্তি নেই। রুহই হলো আসল চালিকা শক্তি। রূহের শক্তিতে শরীর সচল হয় আবার রুহ চলে গেলে শরীর পরিণত হয় মৃত লাশে। অনুরূপ কুরআনে কারীম আল্লাহ্ প্রদত্ত রুহ। বস্তুত এই রুহ মানব জীবনের সভ্যতা ও সজীবতার মুল নিয়ামক ও পরিচালক। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই প্রাণ শক্তি আরব জাতির মাঝে প্রবিষ্ট হলে পর তারা সুসভ্যমণ্ডিত হয়। যে জাতির মাঝে মানবতাবোধ বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, বিশ্বের দরবারে যাদের ছিলো না এতটুকু সম্মান, রাখালিয়া আর বর্বতার ছিল যাদের একমাত্র পরিচয়। আর এই অসভ্য জাতিটিই কুরআন নামক অমীয় শক্তির পরশ পেয়ে জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়। রবের পরিচয় লাভে তারা এগিয়ে গেলেন সবার আগে। মরুচারী বলে খ্যাত বর্বর জাতি পরিচিত হলেন আল্লাহ্র নবীর প্রিয়তম জীবন সাথী হিসেবে। পূর্ব তাদের নামোল্লেখ করা হতো অবজ্ঞাভরে। আর এখন তারাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত বান্দা হিসেবে চীর স্মরণীয়। কুরআনের আলোকছটায় তাদের মাধ্যমে পূর্বের আধার যুগের যবনিকাপাত হয়ে সূচনা হলো এক সর্বোত্তম

যুগের। কুরআনের পরশে আরা পড়ে যায় স্থান, কাল অ পাত্র-সর্বস্থানে। এর পরশে সেই বর্বর মানুষগুলোর মাঝেও প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার হয়। আর সে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন সভ্যতার আলোক মালা। পৃথিবীর মৃত্যু-বৎ মানব পুরীতে তারা সৃষ্টি করেন প্রাণ হিল্লোল। পূর্বে এ আরব জাতি বর্বরতার তিমিরে পড়েছিলেন অচেতন ভাবে। সে তিমিরাচ্ছন্ন অধপতিত জাতিটিই আজ জীবন সভ্যতার বিচারে সবার চেয়ে এগিয়ে। তারা কুরআনের শক্তি মত্তায় বলীয়ান হয়ে উত্থানের পথে অগ্রসর হলে পর রম পারস্যের গর্ব-অহমিকা লুটয়ে পড়ল তাদের পদতলে। তবে সাহাবা (রাঃ) গণের মনে বীরত্ব প্রদর্শনের কোন অভিলাষ ছিল না। বরং তাদের জিহাদ অ কুরবানীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্ব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত সব অনাচারের মূলোৎপাটন। তাই তাদের এ জিহাদ ও কুরবানী হয়েছে স্বার্থক।

কাইসার ও কিসরা নিপীড়িত মানুষের উপর খোদায়ীত্বের দাবী করেছিল। প্রজাসাধারণ তাদের দরবারে এসে নত মস্তক প্রণাম করতে বাধ্য ছিলো। কেউ খোদায়িত্বের দাবী করল শুধু মুখে মুখে। আর অনেকে তাঁর বাস্তবায়নপূর্বক প্রজাসাধারণের মাথায় তার বাস্তবায়নপূর্ব প্রসাধারণের মাথায় উপাস্য সেজে বসল। প্রজাসাধারণকে বাধ্য করল এবং অহংকারের সাথে বল্লো, তোমাদের

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সমাধান করে নাও আমাদের উপাসনা করে। ফলে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের জন্য শোভনীয় ও নির্দিষ্ট শব্দ গুলো রোম-পারস্যের দরবারে ব্যবহারের কুপ্রথা চালু হয়। প্রজাসাধারণ তাদের দৃষ্টিতে ছিল ক্রীতদাসতুল্য। তাদের অমানুষিক খাটুনীর বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ কুক্ষিগত করে গুটি কতেক সামন্ত প্রভু নির্মাণ বিলাস মহল। আস্ম্য ইনসাফের ছিটে ফোটাও ছিল না সে সমাজে। এ শোচনীয় লগ্নে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কেবল রাজ্য জয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ করেন নি। ক্ষমতার লোভ-লালসাও তাদের ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে মানব সমাজে সাম্য অ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথ কন্টকমুক্ত করতেই শুধু তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। তখন রোম-পারস্য এদু’ অপশক্তি আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাড়ায়। সাহাবাগণ (রাঃ) দেখলেন, এ অপশক্তিদ্বয়ের বিলুপ্তি সাধন পর্যন্ত ইসলামের পূণ্যময় আদর্শ বিশ্বজাহানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তা না হলে মানব সমাজে প্রভু ও দাসের বিভক্তিও ঘুচবে না। তাই তারা বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় হাতে তুলে নেন সাম্য ও ইনসাফের পয়গাম। আর সে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে সর্বকঠিন বাঁধা সৃষ্টি করে রোম-পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়। ফলে সাহাবগণ (রাঃ) তাদের তখত-তাউসে হানলেন প্রচণ্ড আঘাত। ভেঙ্গে

দিলেন বহু প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের ভীত। সব বাঁধা দূর হওয়ার পরই ইড্ডীন হলো সাম্যের পতাকা। ইসলামের মুক্তিবাণী ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে। মানুষের দাসত্বের নিপিষ্ট নিঃস্ব-মানব সমাজ সুযোগ পেল প্রকৃত প্রতিপালকের বন্দেগী করার। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল সাম্য। এল জীবনের স্পন্দন। কুরআনকে রুহ বলে আখ্যায়িত করার এই হল উদ্দেশ্য। আর রুহ হলো প্রাণের নাম, জীবনের মূলশক্তি। আর আল-কুরআন আত্মিক প্রাণের নাম। আর যে জাতি এ কুরআন নামক প্রাণের পরশ পাবে তারাই প্রকৃত জীবন্ত হয়ে উঠবে। আর যারা তা থেকে বঞ্চিত তারা হল মৃত্যুপুরীর পচা লাশ। এবার আমাদের ভাববার পালা।

মুসলিম উম্মাহর বর্ত্মান হালচালঃ

কুরআনের এ প্রাণ শক্তি মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিধ্যমান থাকাবস্থায় তারা শিরোন্নত জাতি হিসেবে ছিল স্বীকৃত। আর এই আত্মিক প্রাণ শক্তি হারানোর পর থেকে শুরু হল তাদের গ্লাণীকর জীবন।

মুসলিম উম্মাহ ঠিক ফুটবল সাদৃশ্য। ফুটবলের স্বাভাব হল, সেটা মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলে উর্ধ্বমুখী লাফিয়ে উঠবে। পরিমাণ মত বায়ু ভরা থাকলে বলের লম্ফ বেশী উচ্চ হবে। তবে এটা রবারের গুণের নয়। বরং রবার দ্বারা তৈরী গোলকের মধ্যে ঠেসে দেয়া পাম্প বা হাওয়ার কারসাজি। বল ফুটো হয়ে

গেলে রবারটা চুপসে যাবে। কারণ লম্ফ-ঝম্ফের মুল কারণ যে হাওয়া তা উড়ে গেছে। মুসলিম জাতির অবস্থাও তদ্রুপ। যাবত তারা কুরআনী প্রাণ শক্তিতে বলীয়ান এবং ঈমান সচেতন থাকাবস্থায় কুফরী চক্রের শত নিপীড়নেও নিস্তেজ হয়ে পড়েনি। বরং অত্যাচারের প্রচণ্ডতার মুখে তারা হয়েছে আরও সোচ্চার। আরও প্রতিবাদী। এ কুরআনী শক্তি হারানোর পর পড়ে রইল তার শুধু ফাকা খোলসখানা। সবাই ত এখন মূল ঈমানী শক্তি রহিত নির্জীব নিঃসাড়।

মুসলামানদের অভিযোগ, কুফরী চক্র আমাদের উপর নিপীড়ন করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঘরবাড়ী। অত্যাচার চালাচ্ছে। মুসলমানরা আজ নিপীড়িত হচ্ছে বহু দেশে। এ অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার কারণ আমরাই। দায়িত্বে দায়বদ্ধ আমরা অন্যরা নয়। যেমন ধরুন, কোথাও মৃত লাশ পড়ে থাকলে, সবার দায়িত্ব হলো সেটা সমাধিস্ত করা। অন্যথায় বাতাসে পচা গন্ধ ছরাবে। পরিবেশ নষ্ট করবে। আর মৃতলাশের বিহীত করাটা কোন অন্যায় নয়।

মুসলিম জাতি আজ বিশ্ব নেতৃত্ব অর্জন করতে চাইলে কুরআনী শক্তি নেতৃত্ব অর্জন করতে চাইলে কুরআনী শক্তিতে উজ্জিবীত হতে হবে। তবেই কেবল অন্য কারো সাহস হবে না আমাদের প্রতি চোখ রাঙ্গিয়ে তাকানোর। নিঃসাড় হলে সবাই তার সৎকার করতে এগিয়ে

আসবে। আমাদের অবস্থা এরূপ নয়কি? তাই ভুল সুধরিয়ে সঠিক পথে আসতে হবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত কারাঃ মুসলিম উম্মাহকেই খায়রে উম্মত বাশ্রেষ্ঠ জাতির খেতাবে ভূসিত করা হয়েছে। বিশ্ব-মানবকে তারা সন্ধান দিবে সঠিক পথের, সাড়া জাগাবো প্রতিটি জীবনে। আর বর্তমানের চিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইমাম সাহেবই অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। মুক্তাদির নামাজ কোন রসাতলে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম প্রবরের ওযু নষ্ট হলে নামাযে মুক্তাদীর একান্ত খুশু- খুজু সবই বেকার। ইমাম প্রবরের নামাজ শুদ্ধ হলে পর মুকাদীরও শুদ্ধ হবে।

অনুরূপ আজ মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইনসাফ, সততা, সহনশীলতার অভাব, ফলে পৃথিবী জুড়ে চলছে অনাচার, মুসলামানদের ওপর ভীন জাতির অত্যাচার। এই অর্নায়ের দায়-দায়িত্ব বর্তায় মুসলিম উম্মাহর উপর। আমাদের অনাচারের জন্য ভিন জাতি দায়ী নয়। নিজের সব কিছু সংশোধন ও পরিমার্জনের দায়িত্ব স্বয়ং ইমাম সাহেবেরই। মুক্তাদীর বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ করা অযৌক্তিক। আর করলেও তা হবে হাস্যস্পদ। তখন পাল্টা মুক্তাদীরাই বলবে, আরে আপনার কারণেই তো আমাদের নামাজ নষ্ট হল।

তাই শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতা অর্জন করুন। কারণ আপনারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত খেতাব প্রাপ্ত জাতি। আর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে

জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন ও কুরআনের শক্তি স্বীয় সত্বায় প্রবিষ্ট করানোর মাধ্যমে।

আত্মশুদ্ধির সফল হাতিয়ার আল-কুরআনঃ

হযরত ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেনঃ “উম্মতের প্রথমাংশ ও শেষাংশের সংশোধন শুধু একই আদর্শ দ্বারা সম্ভব।“ আর এ উম্মতের প্রথমাংশের সংশোধন হয়েছে আল-কুরআন দ্বারা। সাহাবী (রাঃ)-গণের লাইব্রেরীতে এবং সংগ্রহে আলকুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ ছিল না। এ মহা গ্রন্থ ভিত্তিতেই সূচীত হয়েছিল তাদের উন্নতি ও উত্থান। অতএব উম্মতের প্রথম যাত্রীদল যে আদর্শের আলোকে সংশোধিত হয়েছেন উম্মতের শেষ দলকেও এ আদর্শের আলোকেই সংশোধিত হতে হবে। সে আদর্শ আল-কুরআন-যে কুরআন জীবন পরিচালনার মূল নিয়ামক।

আল-কুরআনের এ প্রাণ শক্তিতে উম্মাত যতদিন উজ্জীবিত ছিল, ত্তদিন তারা ছিল জীবন্ত-প্রাণবন্ত। যে জীবন এত উর্বর অ সজীব ছিলো যে, বদর রণাঙ্গণে মাত্র তিন’শ তেরজন মুজাহিদ আরবের ভাগ্য চাকার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সে শক্তি নেই। তাই সংখ্যায় একশত কোটি হওয়া সত্ত্বেও কুফরী চক্র আমাদের উপর মোড়লী করছে। পৃথিবীর চিত্র পাল্টে দেয়ার সে শক্তি নেই আজ আমাদের মাঝে।

সার কথাঃ জিবন-জাগরণের স্পন্দন সৃষ্টি করা আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য। আল-কুরআনের বাস্তবায়ন ছাড়া অবচেতন ভাব কাটবেনা। হাজারও কৌশল চালু করুন, তাতে কাজ হবে না। এ কুরআনই আপনাদের শক্তি ও সভ্যতার উৎস। আল কুরআন দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছেঃ

“তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু’শর মুকাবিলায়।“(আনফালঃ৬৫ তম আয়াত)

এ প্রচণ্ড শক্তিমত্তা এলো কোত্থেকে? বিশজন দুইশতের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হবে। এটা কোন কথার কথা বা প্রশংসাগাথা নয়। বরং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক সংঘটিত বাস্তব ঘতনা। বস্তুত ইসলামে সংখ্যাধিক্যের গুরুত্ব নেই। বরং আত্মিক প্রাণশক্তিই সেখানে বিবিচ্য। একজন শক্তিমান হাজারও দুর্বলকে টেক্কা দিতে পারে। তা কি অবাস্তব?

খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)-এর বীরত্বঃ মাহান বিন ওয়ালীদ সাথে মুসলমানদের লড়াই হয়। মুজাহিদ কমান্ডারদের মধ্যে খালিদ বিল ওয়ালিদও একজন। মুজাহিদদের সংখ্যা দশ হাজার আর শুশমন ষাট হাজার। শত্রু বাহিনীর এই সৈন্য সংখ্যার কথা মুসলিম বাহিনীর জানা ছিল না। তাই শত্রুর অবস্থান অ সৈন্য সংখ্যার তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩০০ মুজাহিদ বাছাই করা হল। এ গ্রুপের কমাণ্ডার হলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ। তিনি সেনাপতি

ওবায়দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে বলেন, তিন’শ ব্যক্তির দরকার নেই। আমার সাথে মাত্র ত্রিশজন মুজাহিদ দিন। তা-ই যথেষ্ট। সেনাপতি বললেন, ‘আপনার ঈমানী শক্তিকে মুবারকবাদ! তবে পৃথিবী যেহেতু একটি উপকরণ নির্ভরতান্ত্রিক জগৎ তাই অন্তত ষাট জন মুজাহিদ নিয়ে যান।‘ বহু অনুরোধের পর হযরত খালিদ এতে রাজী হলেন। তিনি ষাটজন মুজাহিদকে নিয়ে অনুসন্ধানে বের হলেন। বাকী সকল মুজাহিদ ছাউনীতে অবস্থান করেন।

মাইল কয়েক যাওয়ার পর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) জানতে পারেন, সম্মুখেই শত্রু ছাউনী।
তাদের সংখ্যা ষাট হাজার। শক্তি ও সংখ্যা বলে তারা মুসলিম বাহিনীর পাঁচগুণ বেশী।

তখন হযরত খালিদ (রাঃ) তাঁর মুজাহিদ দলকে লক্ষ্য করে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। বললেন, ‘আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! শত্রু বাহিনী আমাদের সম্মুখে অবস্থান করছে। এখন আরও মুজাহিদের জন্য পিছনে সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন আছে? আমার মতে, পিছনে কোন সংবাদ না দিয়ে এই ষাটজন নিয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ি ওদের মুকাবিলায় এ ক’জনই যথেষ্ট।।‘

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, তা হোক। আমরা তো এসেছি শাহাদাতের তামান্না নিয়ে। তাই শত্রুর সংখ্যাধিক্যে ভিত হব কেন।
পিছনে সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন কি!

খালিদ (রাঃ) মাত্র ষাট জন মুজাহিদকে সারী বেঁধে দাড় করালেন। অপরদিকে সুমজ্জিত ষাট হাজার শত্রু সেনা। ইরানী সেনাপতি মাহান অগ্রসর হয়ে বল্লো, ওহে খালিদ! আমাদের ধারণা ছিল, মুসলমানরা বেশ বুদ্ধিমান। এখন তোমাদের দেখে ভারী বোকা মনে হচ্ছে। ষাট হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র ষাট জন যুদ্ধ করতে এসেছ! তোমারা ফিরে যাও। দয়া-দাক্ষিণ্যে তোমাদের ভরে দিব। প্রত্যককে দু’মন খেজুর, অর্থ-কড়ি যা চাও সব দিব। এতে সুখে সাচ্ছন্দে তোমরা দিন কাটাতে পারবে। এই ভুখা-নাঙ্গা মানুষগুলোকে নিয়ে এসেছ কেন? কেন অযথা অত্যাচার করছ নিজেদের উপর। নিজ দেশে ফিরে যাও। তাতেই তোমাদের মঙ্গল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) মাহানকে লক্ষ্য করে বল্লেন, ওহে মাহান! তুমি কমাণ্ডার না বক্তা। লজ্জা হয়না তোমার, যুদ্ধের ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে ভিরুতার উপর প্রলেপ দিচ্ছ! আসলে তোমরা যুদ্ধ করতেই জাননা। খালিদ (রাঃ)-এর কটাক্ষবান শুনে মাহান চরম রে উঠে। ষাট হাজার সৈন্যকে নির্দেশ দেয়, এই ষাটজনকে বন্দী কর!

নির্দেশ পাওয়া মাত্র ষাট জন মুজাহিদের উপর ষাট হাজার সৈন্য ঝাপিয়ে পড়ল। তখনই ফাক গলিয়ে ষাটজন নির্ভীক মুজাহিদ ঢুকে পড়েন ওই বিশাল সীন্য সারীর ভিতরে। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুসলিম

মুজাহিদদের আর দেখা গেল না। ময়দান জুড়ে শুধু তরবারীর ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল। তিন ঘন্টার ভিতরে ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। ষাটজন মুজাহিদ বিজয়ী মাল্য ছিনিয়ে আনলেন ষাট হাজার সৈন্য থেকে। উপরন্তু কাফেরদেরকে বহুদুর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে তারা ছাউনীতে ফিরে এলেন।

ওদিকে দশ হাজার মুজাহিদ জেহাদে ঝাপিয়ে পড়ার সূতীব্র বাসনা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। আর মাত্র ষাট হাজারকে কুপোকাত করে ফিরে এলেন মাত্র ষাট জনে।

ঈমানী শক্তিই মুল নিয়ামকঃ মাত্র দশজন এক হাজারের উপর বিজয়ী হওয়াও কল্পকাহিনী নয়। এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তাবতা। সাহাবায়ে কেরাম এখনও শত্রুর সংখ্যাধিক্যে আর অস্ত্র বলে হিম্মত হারাননি। বলতে চাই যে, কিসের এ শক্তি। কোত্থেকে এল তা। হ্যাঁ, এ শক্তি নবুওয়তের নূর ও বরকত। এ শক্তি ঐশী ও কুরআনী শক্তি সাহাবাদের মনে প্রবিষ্ট হয়ে ব্যক্তিকে করেছে হাজারের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ। আর এ প্রাণ শক্তি উড়ে গেলে মুসলমান পরিণত হয় একটি নিসাৎ গোস্ত পিণ্ডে। তাই শুধু তীর তলোয়ার ও দৈহিক শক্তি বলে আপনাদের বিজয় লাভ হবে না। বস্তুতঃ ঈমানী শক্তি বলেই তীর, তলোয়ার চালাতে হবে, তবেই বিজয় আসবে। পক্ষান্তরে সশস্ত্র অথচ মনোবলহীন ব্যক্তির তরবারী বেকার। মনোবল থাকলে তবেই অস্ত্র দিয়ে কাজ

হবে। অন্তরই মুল চালক আর হৃদয় মন শক্তিশালী হয় ইমান ও তাওহীদের পরশে। ঈমানের পরশেই মন শক্তিশালী হয়ে উঠে। সার কথা জীবন সঞ্চারলণ ও মৃত প্রাণে যিন্দেগীর ছোয়া এনে দেয়াই আল-কুরআনের কাজ।
অনুবাদঃ আহমাদ আল-ফিরোজী

হে উমর এসো ফিরে
মুঈনুল ইসলাম সাইয়্যেদপুরী

দুনিয়ার আজ ঝঞ্ঝার মেঘ জুলমাতে গেছে ঘিরে,
সাম্যের দিশারী হে উমর এসো ফিরে
নাই আশা আলো সব নিঝঝুম
কাঁদে ধরনীর শত মজলুম।
জালিম সেনারা ছাউনি ফেলেছে জীবনের তীরে তীরে,
ন্যায়ের প্রতীক, জালিমের ত্রাস হে উমর এসো ফিরে।
অনাথ এতীম অনাহারে আজ মরে
কেউ নাহি চায় তাহাদের পানে ফিরে, অবহেলিত বঞ্চিত দল

তোমারে খুজিয়া ফিরে ,

দীন -দরদী অনাথের নাথ

হে উমর এসো ফিরে।

ইহুদী -নাসারা , মুরতাদ দল

আজ লড়ে কোরআনের সাথে (!)

নিরুপায় জাতি তোমায় বিহনে উপায় খুজিয়া মরে।

রাহবারে কামিল , শানিত অসি ,

হে উমর এসো ফিরে।

সমকালীন প্রসঙ্গ

সুড়ঙ্গপথঃ পতনের ডাক

প্রিন্সিপাল এ , এফ, সাইয়েদ আহমাদ খালেদ

শাস্বত ইসলাম ; ঋতুর পরিবর্তনে দুনিয়ার পরিবর্তন সাধিত হলেও ইসলাম অপরিবর্তণীয় - এর বাণী অলংঘনীয়। চির অনুপম ধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলমানগণ সর্বকালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও কল্যাণবহ , উন্নত ও গর্বিত একটি জাতি। এ জাতির বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনে সদা লিপ্ত জগতের অন্যান্য বিজাতীয় সকলে ইসলামের বিলুপ্তি সাধনে দৃপ্ত শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এতা নেশা নয়, ভিন্ন ধর্মীয়দের পেশা। নবী জীবন থেকে এ শত্রুতা

চলে আসছে, প্রতিটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে চলে আসছে একের পর এক ষড়যন্ত্র বিভিন্ন কায়দায়। ষড়যন্ত্রের সাফল্য অর্জন সরাসরি ঘোষিত আক্রমণে সম্ভব নয়। জেনেই শত্রু পক্ষ সবসময় বন্ধুত্বের ভান করে, বিকল্প হিসেবে ‘সুড়ঙ্গ পথ’ বেছে নিয়েছে। মুসলিম দেশ সমূহে এ পথেই ঢুকছে ধ্বংসমুখী অপতৎপরতার সকল উপাদান ও ইসলাম বিনাসী উপসর্গ। সুড়ঙ্গ পথের কারণেই বাংলাদেশের অস্তিত্ব আজ বিপন্নের সম্মুখীন; অপশক্তির বিষাক্ত ছোবলে মুসলিম কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ধর্ম রক্ষা করা দায় হয়ে পড়েছে-দেশের নব্বই শতাংশ মুসলমান আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অপকৃষ্টির বন্ধুরা (?) আসছে চোরা পথে, আসছে ছদ্মবেশে, এরা মুসলিম নামের ছদ্মাবরণের বেঈমান তৈরী করছে এবং এ শ্রেণীর বেঈমানদের দ্বারাই ঈমানী জিন্দেগীর মূলে কুঠারাঘাত করছে। সরকারের নির্লিপ্ততার কারণে আজ দেশময় ইসলাম অ মুসলিম বিরোধী চক্রন্ত মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। বিভিন্ন এন,জি,ও সংগঠন এ কাতারেরই এবং এদের উদ্দেশ্যের মুখোশ ইতিমধ্যে উন্মোচিত হয়ে গেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির শত্রুতা তো লেগেই আছে। সেদেশের বন্ধুরা ক্ষতির উপকরণ সমূহ সুড়ঙ্গ পথেই পাচার করে চলেছে, তারা বেছে নিয়েছে বেঈমানী রক্তে লালিত ইসলামের কলংক তসলিমা-কবীর-আহমদ শরীফ গংদের। ট্রেনিং প্রাপ্ত এরা আঘাত হেনে চলেছে মুসলিম অনুভূতির ওপর, মিথ্যার জাল বুনে

চলেছে বিকৃত ও লেখনির ভিতর দিয়ে; এরা ভারতের মদদপুষ্ট নির্ভেজাল সেবক, চির কুখ্যাত মীর জাফর আলী খানের যোগ্য উত্তরসূরী। দেশের অগণিত মুসলিম প্রাণ দারুন ক্ষুদ্ধ, দলমত নির্বিশেষে চিহ্নিত শত্রুদের শাস্তি কামনায় সোচ্চার।

চরম সত্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অপব্যাখ্যা ধৃষ্টতা চলছে, পবিত্র বাণীর বিকৃত অর্থে প্রচার করছে চিহ্নিত কতিপয় পত্রিকা। ইসলামের নাম মুছে ফেলার অপপ্রয়াস চলছে জোরেসোরে ‘বিসমিল্লাহর’ পরিবর্তে ‘জয়হোক’ শব্দ সংযোজনের চক্রান্ত চলছে। অথচ এই বিসমিল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেই যে সরকার মসনদ লাভ করেছে, সেই সরকার সকল দুষ্টগ্রহ ও মুরতাদ দমনে কেন নীরব-অপসংস্কৃতি ও অপশক্তির মূলোৎপাটনে কেন তৎপর নয় এতাই দেশবাসীর সংগত জিজ্ঞাসা। নাস্তিক আহমদ শরীফ, ঘৃণিত তসলিমা-নাসরিন এ ধারার কলঙ্কময় সৃষ্টি, মুসলিমের ঘরে জন্ম নেওয়াটাই হয়েছে এদের অন্যায়-তাই জাহেলী দুঃসাহস দেখায় পবিত্র কুরআনের ভুল ধরার। ধর্মদ্রোহী ও মতলববাজদের শায়েস্তা করার দায়িত্ব নিঃসন্দেহে সরকারের নির্লিপ্ততায় জাতীয় স্বত্তার বিলুপ্তি ঘটায়; পরিণতি হয় ভয়াবহ। মীর মর্দান অ মোহনলালের অনুপ্রেরনা আমরা কেন বিস্মৃত হয়ে যাই, এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। ইসলামের গৌরবময় অতীত ইতিহাস মুছে ফেলার জন্য যারা

ময়দানে নেমেছে, আল্লাহ্র কালাম অ বিধান নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, লাগামহীন বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছে, খ্রীস্টান সংগঠন-পুষ্ট বিপথগামী যে সব মুসলমান নামের কুলাঙ্গার নানাভারে খোদায়ী বিধি-বিধানের সমাধি দানের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, নগ্ন আক্রমণ শুরু করেছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ও রুখে দাঁড়াবার দায়িত্ব কি একমাত্র এদেশের আলাএম সমাজের? তর্কের অবকাশ নেই, দেশকে সার্বিকভাবে রাহু মুক্ত করতে হলে, অবশ্যই সুরঙ্গ পথের আনাগোনা বন্ধের পদক্ষেপ ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত বিজাতীয় প্রেমিকদের আশু উৎখাত প্রয়োজন। বিলম্বে পলাশীর পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র কিছুই নয়।

মুরতাদ অ ইসলাম বিরোধি চক্রের দমনে গণদাবীর প্রতি আমল না দেওয়া বা দীর্ঘ সূত্রিতা প্রকারন্তরে দেশের ধ্বংস ডেকে আনা নয়কি? গণতান্ত্রিক সরকারের এ ব্যাপারে বিলম্বিত নীতি সত্যিই বেদনাদায়ক! আল্লাহ্র দুশমনদের সাথে কোন মুমিনের বন্ধুত্ব হতে ও থাকতে পারে না। বিসমিল্লাহ্ ভিত্তিক কর্মের নমুনা প্রদনকল্পে, সকল অপশক্তির জোয়ার রোধে বর্তমান সরকারকে সাইমুম সম পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দ্বীনের দেশের অ জাতির শত্রুকে শায়েস্তা করতে হবে। হযরত আলী (কঃ)

বলেছেনঃ “শত্রুর শেষ রক্ষা করতে নেই। সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।“

সিংহকে দুর্বল করতে হলে খাঁচায় পূরে বাঁচিয়ে রাখার মত খাবার পরিবেশন করতে হয় মাত্র। কাউকে ঘায়েল বা আক্রমণ করার শক্তি যেন না থাকে, তার, এটাই উদ্দেশ্য। সিংহতেজা জাতি মুসলমানদের ময়দানী সমরে কাবু করা সম্ভব নয় বিধায় ইসলামী সংস্কৃতির বিপরীত অপসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলমানের মস্তিস্ক ধোলাই করার মাধ্যমে ঈমান ধ্বংসের সুতীব্র প্রয়াস ঢলছে। এ ধরনটা হচ্ছে ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া; আত্মবিস্মৃত হলেই পতন তরান্বিত। এহেন প্রক্তিয়ায় বিজাতীয় বিজয়ের অতীত নমুনা আছে বৈ কি! প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি বা কৃষ্টি হচ্ছে তার পরিচিতি-তার জীবনের খোরাক। এ চিন্তার আলোকেই বিশ্ব মুসলিম ধ্বংসে ‘সুড়ঙ্গ পথ’ ব্যবহৃত হচ্ছে; এদেশে মুসলিম চিন্তা- চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থি সকল উপাদান বন্ধু প্রতিম (?) প্রতিবেশী দেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানী হচ্ছে। তৈরী হয়ে গেছে এদেশের বুকে বন্দে মাতরম (নাউজুবিল্লাহ) মনমানসিকতার সমর্থনপুষ্ট কিছু দালাল। এরা নাকি পণ্ডিত! ন, এরা “আনন্দবাজারী” ভিত্তিক ট্রেনিং ও পুরষ্কার প্রাপ্ত ‘পণ্ডিত’ মূর্খ, হস্তী সম পদচারণা হলেও দেহের বিশালতা ক্ষুদ্র চোখে প্রতিভাত না

হওয়ার কারণে হাতীরূপ হস্তীমুখ। পরকীয়া বৃত্তিতে অভ্যস্ত বলে মহা বিশ্বের অক্ষয় শক্তি ইসলামের বিস্ময়কর বিজয় ও কৃতিত্বের অতুলনীয় বিশালত্ব এদের হস্তীরূপ চোখে ধরা পড়ে না।

শুধু মুসলিমের নয় মানবতার গর্ব, বিশ্ব মজলুমের পরম বন্ধু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম; অপরাজেয় একনাম ও মহান জাতীয় ব্যক্তিত্ব নজরুল। দুঃখের বিষয়, শহরের বড় বড় অধিকাংশ বই-এর দোকানে ‘সঞ্চিতা’ চাইলে বিক্রেতা এগিয়ে ‘সঞ্চয়িতা’। এরূপ কেন প্রশ্নের জবাবে ক্রেতাকে জানানো হয়, “সঞ্চিতা/টঞ্চিতা এদেশে চলে না সাহেব।“ বিস্মিত হই এবং শান্তনা লাভ করি কবির এই বর্ণনায়, “অমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।“ সাবাস বাংলাদেশ! সাবাস বিক্রেতা!! সাবাস বন্ধুদের ট্রেনিং!!! কি সুন্দর অ চমৎকারভাবে ঈরটধভ ষট্রদ (মস্তিষ্ক ধোলাই) চলছে। বিশ্ব মানবতার গর্বিত ও মজলুমের অহংকার কবি নজরুলের পরিচিতি বাংলাদেশে নেই-থাকলেও ক্ষীণ দীপ শিখার ন্যায়। পক্ষান্তরে পরিচিতি এখানে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার কবি রবি ঠাকুরের। দোকানদারের এ স্বচ্ছ (?) ধারনায় পরিপুষ্টরাই ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। তসলিমা গংদের রথশোভা যাত্রার বাহাবা দানকারী শরিফ এরা। ইসলামী

পরিমণ্ডলে এ সব হায়েনাদের বিচরণ বড় কষ্টদায়ক।

ওহুদ প্রান্তরে ইসলাম বৈরী কোরেশদের ক্ষুদ্র দল, মুসলমানদের সামান্য ভুলের কারণে অরক্ষিত ও দুর্বল অংশ দিয়ে ঢুকে পড়ে-নিশ্চিত বিজয়ী উদীয়মান বীর শক্তির পতন ঘটায় (অবশ্য জাতীয় জীবনে এটা পতন ছিল না-এতা শিক্ষা)। এই দুর্বল অংশকে ইতিহাসে ‘সুড়ঙ্গ পথ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বের মুসলমান জেগেছে সত্য; কিন্তু এদের দুর্বল ও ধ্বংস করতে সুড়ঙ্গ পথের গুরুত্বকে শত্রু পক্ষ বিশেষভাবে মূল্যায়ণ করে চলেছে। বন্ধু (?) ভারত এর ব্যতিক্রম নয়। বিজাতীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত, এমনকি তাদের কৃষ্টিতে সমৃদ্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পরিষদ ইসলামের ইতিহাসের কিরূপ সমালোচনার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। প্রতিবাদকারী সুশিক্ষিত গোষ্ঠীকে জানাই মোবারকবাদ। উল্লেখ্য, ইসলামের প্রজ্জল ইতিহাসের বাস্তবতা উপলব্ধি করেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈনক খ্যাত্নামা হিন্দু ভাইস চ্যাঞ্চেলর বৃটিশ আমলে, ইসলামের ইতিহাস পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক বিভাগ খোলেন। ধিক! শত ধিক সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের বিরুদ্ধাবাদী পরিষদভুক্ত তথাকথিত বরেণ্য ব্যক্তিদের; ঘৃণা ও লজ্জায় মুখ লুকায়। মুসলিম নামধারী

এ শ্রেণী ইসলামের কলংক। এই জাতীয় পরিষদের অস্তিত্ব না থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং এই মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সকল শিক্ষাঙ্গণ থেকে, আগামী প্রজন্মকে ভুল তথ্য পরিবেশনের হাত থেকে রক্ষা লক্ষ্যে অপসারণ দরকার। এদের চক্রান্ত মোকাবিলায় তৌহিদী জনতাকে জাগতে হবে।

জানাটা ইসলাম নয়; জেনে আমল করাটাই ইসলাম। যারা জানেও না মানেও না-শুধু মুসলিম নামের মোড়কে পরিচিত, তারাই ক্ষতিকারক। অপ-সমালোচনা, ব্যাখ্যা ও ভিন্ন দৃষ্টি ও আদর্শের বন্যা প্রবাহে এরা উপযুক্ত। এদের মদদ দানের প্রয়োজনে প্রকাশ্য রাস্তা পরিহার করতঃ সুড়ঙ্গ পথের ব্যভার শুরু হয়েছে। সরাসরি ভারত-ভীতি যতটা না আমাদের বিহ্বল করতে সক্ষম, তার চেয়েও অধিক ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই মদদপুষ্ট শ্রেণীর বসবাস ও আনাগোনা। এদের শায়েস্তা করা গণদাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের নৈতিক দায়িত্ব; সহযোগিতা থাকবে ১২ কোটি নাগরিক সমৃদ্ধ নির্ভেজাল মনের সকল মুসলমান। সাপ খেলা দেখা অনেক হয়েছে। সাপুড়িয়ার গান সাপের ছোবল মারার অভ্যাসতাকে কি ভুলাতে পারে? ইসলামের বিরুদ্ধে তসলিমাদের অবস্থাও আজ এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ বাংলাদেশ দুটি শিবিরে বিভক্তঃ একটি ইসলামপন্থী, অন্যটি পরিপন্থী। একশ্রেণীর ঘোর-প্যাচমনা ব্যক্তি ইসলাম পরিপন্থীদের নিয়ে খালা শুরু করেছে। এযেন ‘যা যা দি’ পত্রিকা। খোদায়ী বিধি-বিধানের প্রতি ইসলাম পরিপন্থী দল আঘাত হেনেই চলছে; এ স্পর্ধা কার ইঙ্গিতে এতাই দেশবাসীর জিজ্ঞাসা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে আল কুরআনের পবিত্র বাণী সংযোজন, মুসলমানের নামে পরিচিত হলের পরিচিতিতে ‘মুসলিম’ শব্দ ব্যবহার ইত্যাকার আর কত কি করা যাবে না। এরূপ প্রতিবাদ করার সাহস কি ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভারতের শিবসেনা নায়ক বাল থ্যকারে বাবু কাছ থেকে অর্জন করেছে? যারা সংযোজন বিরোধী হৈ চৈ শুরু করেছেন তাদের ওস্তাদী প্যাচ আমদানী হচ্ছে এদেশে থেকে নয়-অন্য কোথাও। দেশ মুক্ত করার সংজ্ঞায় কি ছিল এ সব পবিত্র ও বাঞ্ছনীয় শব্দাবলী তুলে ফেলতে হবে? আগে ছিল। তুলে ফেলতে কে বলেছিল? ব্যক্তির মালিকানায় বাংলাদেশ নয়, পরিকল্পিত নোংরামীর কঠোর জবাব দানে সিংহ তেজা মুসলিম জনতা এখন পথে নেমেছে-যতেচ্ছাচারের অবসানে চাই আমরা। ঘৃণিত নেশায় পরিচালিত আল্লাহ্র দুশমনদের সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।

আমার পরম ভক্তিভাজন মরহুম আব্বার বৃটিশ আমলে লিখিত প্রতিবাদী লেখা পড়েছি।
জানতে পারি, বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে

ডব্লিউ, জে, ম্যাকিন নামক এক ইংরেজ মুসলিম পুতঃচরিত্রবতী মহিলাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছিল। লেখনির দ্বারা তারা লেখার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে, আন্দোলন শুরু হয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। ইংরেজের মসনদ টলটলায়মান হওয়ার উপক্রম। কিংকর্তব্য বিমুখ বৃটিশ সরকার লেখার সকল কপি বাজেয়াপ্ত করতঃ ম্যাকিন সাহেবকে ভারত ছাড়া করে এবং সরকার মুসলিম উম্মাহর কাছে মাফ চেয়ে নিস্কৃতি লাভ করে। আর আজ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে চলছে ব্যক্তিগত নয়-কুরআনের অবমাননা, ধর্মের অপসমালোচনা। কোন বিহিত নেই। আফসোস! সদাসয় সরকার আল্লাহ্র কাছে কি জবাব দেবেন? ম্যাকিনের সরকার ম্যাকিনকে তাড়ালো। হে বাংলাদেশের মুসলিম সরকার আপনি তসলিমা- কবীর-শরিফ গংদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? মহাকবি নজরুলের কবিতা পড়েন নাইঃ “দুনিয়াতে নত নয়, মুসলিম কারো শির।“ ন্যায়ের সংগ্রামে যারা আজ পথে নেমেছেন তারা কেবল আলেমই নন, জিন্দাদিল জিহাদী মুসলিম। জিহাদের শিক্ষা ঘরমুখী নয়-রণমুখী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে পবিত্র শব্দাবলীর সংযোজনকারীরা জাতির সুসন্তান, এদের প্রতি আক্রমণ চালান হয় কোন সাহসে, কাদের ইঙ্গিতে? ‘লা-ইলাহার’ পতাকাবাহী মানুষের ন্যায়সংগত দাবী ও অকৃত্রিম আকাংখার বাস্তবায়নকে কোন

উস্কানিতেই নিস্তব্ধ ও প্রতিহত করা যাবে না-সময়ের ব্যাপার মাত্র।

শোভন ও অশোভন আলাপে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির পরিচয় ফুটে উঠবে। নারীর ন্যায় সংগত পাওনা ও অধিকারের রূপরেখা অতি সুন্দর ও সুবিন্যাস্তভাবে ইসলাম একে দিয়েছে। একে উমভডণ্রধমত করার কথা বলার অধিকার কার আছে? যদি বলে কেউ, তা বাড়াবাড়ির নামান্তর। বেপর্দায় পথে নেমে হাত উচিয়ে নিছক একটি দৃশ্যের অবতারণা করতঃ কণ্ঠের গগণবিদারী চিৎকার ধ্বনী দ্বারা কিছু আদায় করা সম্ভব না হলেও, অন্তত পক্ষে অদৃশ্য শক্তির অভিশাপের পরিণাম নিয়ে হয়তো ঘরে ফেরা যায়। বেহ্যাপনার বিরুদ্ধে যারা কথা বলেন, তারা দেশ ও জাতির সম্মানিত সম্প্রদায়। ধর্মের সূক্ষ্ম এবং জটিল সম্মানিত সম্প্রদায়। ধর্মের সূক্ষ্ম এবং জটিল সমস্যাবলীর সমাধান যারা দেন তারা আলাএমকুল চুড়ামণি, মুফতি সমাজ-ফতোয়াবিদ। আদালতে যারা সওয়াল জবাব ক্রেন, আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তারা আইনবিদ। ফতোয়া দেওয়া ও আইনের ব্যাখ্যা ইত্যাদি করা নিশ্চয়ই রাখালের বা মুর্খের কাজ নয়? ফতোয়াবিদ অ আইনবিদগণ যেহেতু একটি দেশের ধর্মীয় ও সাধারন দৃষ্টিকোণ হতে সুশিক্ষিত সন্তান, সেহেতু তারা অবশ্যই ‘ফতোয়াবাজ’ ইত্যাদি ব্যাঙ্গার্থক শব্দে সম্বোধিত হতে পারেন না। তারাই মুর্খ, আস্তাকুড়ের সম্পদ যারা

বিকৃত শব্দদ্বারা প্রকৃত পরিচয় পরশ্রীকাতরতার আগুন দিয়ে পোড়াতে চায়। এরা সমাজের লাঞ্ছিত সম্প্রদায়; একটু খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সম্মানীত ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে এই শ্রেণির নারী-পুরুষ অসম্মান দান ও অশোভন সম্বোধনের ফলে কতনা যন্ত্রণা অ দুর্ভোগের কবলে পতিত। ‘বাজ’ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কি ফতোয়াবিদগণকে, গলাবাজের দল দ্বীনের রাস্তার কর্ম সম্পাদন থেকে নিরস্ত্র করতে পারবে? ৩০শে জুন/৯৪তে কি আলেম সমাজের ভুমিকা অবলোকন করে নাই ধর্ম-শত্রুগণ? শুধু আলেম নয়, বিশ্বাসী মুসলমানের নিকট মৃত্যু হলো পেয়ালা পূর্ণ সরবত। আলেমদের সংগ্রাম অ তাকোয়া ভিত্তিক জিহাদের ফলেই পৃথিবীর মুসলিম দেশসমূহ তাগুতী শক্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে-মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছে। ইতিহাস পড়ুন, খতিয়ে দেখুন। আমার জানামতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও বহু আলেম অবদান রেখেছেন। সুতরাং সংযত ও ভদ্র ভাষার প্রয়োগদ্বারা বিষোদগারীগণ আত্ম সংশোধনের পরিচয় দিয়ে সমাজে বরণীয় হন এতাই প্রত্যাশা।

দাদা বাবুদের শিখানো ময়না-টিয়া, শ্লিকের বুলি কেবল জাতীয় বেঈমানদের মুখে শোভা পায় এবং তা পাগলের প্রলাপ বলেই এ মাটির সংখ্যাধিক্য মুসলিমের নিকট বিবেচিত হয়। আমার সত্তার না পরিচিতির

অবলুপ্তিতে এক অবলুপ্ত স্থানে জোর পুর্বক বিজাতীয়ের স্থান দানে আমার সঙ্গত চিৎকার ও আপত্তি আছে বৈকি। এতে 'মৌলবাদী' হয়ে গেলাম বা হয়ে গেল একটি সম্প্রদায়। পক্ষান্তরে যারা কুরআন ও কুরআনিক পবিত্র বিধানের বৈপরিত্য ঘটানোর দুঃসাহস দেখাতে শুরু করেছে তারা নিশ্চয় 'ইবলিসবাদী', ইববিস আল্লাহ্র অভিশপ্ত ও বিতাড়িত। আল্লাহ্ ও রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশে, "ধর্ম রক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ইবলিস ও তার সমর্থকদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও।" এ বাণীর আলোকেই শয়তানের চেলা তসলিমা গংদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যৌক্তিক, তাদের শাস্তি দান ঈমানী দায়িত্ব এবং দাউদ হায়দারে ন্যায় তাদের নির্বাসন অতীব জরুরী। আমার ন্যায়সঙ্গত আবেদনে যদি মৌলবাদের আখ্যা পায়, ন্যায্য চিৎকার যদি সম্প্রদায়িকতা হয় তাহলে অন্যের অন্যায় লেখনি, গ্লানিময় উক্তি, ঘৃণিত আক্রমণ কোন সংগার রূপ পাবে? জিহাদী ভুমিকায় মুসলমান আজ পথে নেমেছে ইয়াই গাত্র দাহ শুরু হয়েছে, আবোল-তাবোল বলা আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তির অব্যবহিত পরের কর্মকাণ্ডগুলি বড়ই দুঃখজনক। সেদিনের বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর সংশোধন করা অত্যাবশ্যক, ঈমানী দায়িত্বও বটে। কবির ভাষায় বলতে হয়, "একে একে মনে উদিল স্মরণ বালক কালের কথায়" মত ব্যথার সাগর উথলিয়ে উঠলেও, এখানে বর্ণনার তরঙ্গাঘাত সৃষ্টি করতে পারছি না। শুধু

এতটুকু আদায়ে ও প্রতিষ্ঠার অবহেলায় মুসলিম স্বত্ত্বার বিলুপ্তির পরোয়ানা জারী হবে সম্মুখভাগ দিয়ে নয়, সুড়ঙ্গ পথে, যেমন হয়েছিল স্পেনের মুসলিম শাসনের পরিণতি, পালাবারও সুযোগ পায়নি। ভুলের মাশুল দেয়া থেকে নিস্কৃতি লাভের উপায় হলো অপসংস্কৃতি ও অবাঞ্ছিত আগমন রোধ, ষড়যন্ত্রকারীদের শায়েস্তা করা এবং সর্বস্তরে জাতীয়তাবোধ শিক্ষাদান। হ্যাঁ, রাষ্ট্রনীতির কারণে এদেশের কোন সম্মেলনে বা কোন অনুষ্ঠানে বিদেশী কোন মেহমানকে ডাকা হলে তাকে অবাঞ্ছিত ও অপ্রাসঙ্গিক ভাষণ দান করতে বা বিদ্রোহাত্মক কোন কথা যেন না বলতে দেওয়া হয়-বক্তব্যের সীমা যেন লংঘন না করে, সেদিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। লর্ড মেঘনাদ জগদীশ চন্দ্র দেশাই বাংলাদেশে এসে গুরুদেবের ভুমিকার কথা বলে গেছেন। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগ ভুল হয়েছিল বলে যে কৌশলগত বিদ্রোহাত্মক বক্তব্য রেখে গেছেন। সেটা ‘লর্ড’ খেতাব দানকারীদের দেশে গিয়ে বললেই বেশী মানানসই হতো; হয়তো তারা ভুলের সংশোধনের চেষ্টা পেত ও অন্যপক্ষে মেঘনাদ সাহেব শেতাঙ্গ জাতির কাছে অপূর্ব পরামর্শ দাতা হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দুটি মুসলিম রাষ্ট্র; কেন গঠিত হল এই-ই তার গাত্র দাহ। তাঁর জানা উচিৎ তাঁর প্রয়াত মুরুব্বীদের বা কারো দয়ার এ দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়নি, ঈমানী জোশে ও জীবনের বিনিময়ে

হিস্যা আদায় করে নেয়া হয়েছে। হিন্দুবাদ ‘দিতে’ জানে না কোন কালেই, জানলে কাশ্মিরে মুসলিম রক্তের হলী খেলা চলত না। আফসোস করে লাভ নেক; যেটুকু আছে তাই অখণ্ড রাখার চেষ্টা করুন!

অতীতে সুড়ঙ্গ পথে সাফল্য লাভের দিক নির্দেশনাই (তোদের সুড়ঙ্গ সাফল্য) ছিল বিশ্ব শঠ ইংরেজ জাতের ‘এক চামড়া’ যায়গা পাওয়ার কৌশলগত সফলতার ফলে আরব এবং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ দখল। সে করুন ইতিহাস, কম-বেশী জানা আছে সবার। ইংরেজদের যোগ্য উত্তরসূরী আধুনিক ভারত ‘চামড়ার’ মাধ্যমে নয়, হয়তো সামরিক সংঘাতের দ্বারা নয়, ইসলামী জাতীয়তাবাদ উদ্বুদ্ধ বিপুল মুসলিম জনতা ক্ষেপিয়ে নয়-সুচতুর প্রক্রিয়ায় বশংবদ দালাল সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ইসলাম বৈরী সংস্কৃতি আমদানী করে, জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চায়।

ভারতের নানা ধরনের ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে বর্তমান সরকার আত্মঘাতি দিকটি বেছে নিচ্ছে। গণমতে সরকার আত্মঘাতি দিকটি বেছে নিচ্ছে। গণমতে কান দিচ্ছে না-কারণ কি? দেশের ভিতর দিয়ে বিতর্কিত দেশ সমর বাহিনি পরিচালনার সুযোগ জামনা করেছে। এ কামনার হেতু কি, শাওকগন কি তা অবহিত নন? আবার বলি, এক চামড়া যায়গা দান ছিল ভারতের মুসলিম শাসকদের বা রাজা-বাদশাহদের অদূরদর্শিতা। তাঁর পরিণাম ইতিহাসের পাতায় বিধৃত। এতেও

কি আমাদের চেতনার দুয়ার খুলবে না? আল্লাহ্, রাসূল, কুরআন ও হাদীসের মর্যাদা চির সমুন্নত ও সমুজ্জল রাখার তাগিদে মৃত্যু যদি আসে, সে মৃত্যু গৌরবের, সাফল্যের এবং স্রষ্টার কাছে আছে এ মৃত্যুর উত্তম পুরষ্কার। একটি মুসলিম সরকার, অথচ এ প্রসংগে তাঁর কোন তাপ উত্তাপ নেই। তাঁর অহেতুক বিলম্বে ধর্মে বৈরী মুরতাদদের স্পর্ধা বেড়েই চলছে। সরকার বৃহত্তম জনগণের মনে ক্ষোভ মিশ্রিত দারুন ব্যথার জন্মদান করে চলেছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার।

আলেম সমাজ আমাদের গর্বতো বটেই। নাম সর্বস্ব মুসলমান যারা, তাদের সকল লৌকিক অনুষ্ঠানে আলেমদের লাগে বৈ কি? তবে মরণ যাত্রার প্রাক্কালে ‘তওবা’ পড়ানোর ব্যাপারে আলেমদের না লাগলেও, যানাযায় না লেগে পারে না। শুনিনি মুসলিম নামে কাউকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর পর যানাযা না করে দাফন করা হয়েছে। এই সম্প্রদায় হচ্ছে মৌলবাদ; এর সমর্থকগণও স্বাভাবত মৌলবাদী। এদের অর্থ্যাৎ মৌলবাদীদের শায়েস্তার প্রয়াসে ‘ঘাদানিক’ তৈরী করা হয়েছে। ঘাদানিকের আহবায়িকা জাহানারা ইমামেরও কাফন-দাফন হয়েছিল। শরিয়ত মোতাবেক আল্লাহ্র কালামের ধারক মৌলবাদী আলাএম কর্তৃক পবিত্র পাক কালাম দ্বারা আহবাহিয়কার নামাজে যানাযা সম্পন্ন

হয়েছিল নয় কি? যদি হয়ে থাকে, তা হলে এত উম্মা কেন আলাএম কুল তথা ইসলামী চেতনার ঝাণ্ডাবাহীদের নির্মূল করার ব্যাপারে? আবরাহার মক্কা অভিযান সম্পর্কে জানা আছে? আল্লাহ্র ঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল না আবরাহা নির্মূল হয়েছিল? কথা মেপে বলতে ও পা গুণে চলাই জ্ঞানীর লক্ষণ। সীমালংঘনকারীরাই যুগে যুগে জব্দ হয়েছে, আজও হচ্ছে। ভেবে দেখুন, জৈনকা মহিলা কবি উক্তি করেছেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত ইবাদতের সামিল। এদেশে বসে ঐ সঙ্গীত দ্বারা ইবাদত করলে যতটা না পূণ্য সঞ্চয় হবে, শান্তি নিকেতনে যেয়ে করলে এ কবির পূণ্যই কেবল সঞ্চয় হবে না, ঠাকুর মহাশয়ের আত্মাও অধিক শান্তি লাভ করবে। পরপারের কৈফিয়তের হাত হতে হয়তো মুক্তি (?) পাওয়া যাবে। সুড়ঙ্গ পথীয় ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা চালু করা বাংলাদেশে কি সম্ভব? অন্তঃসার শূন্য কোন উপদেশ এখানে কার্যকর নয়। ‘বাংলা’ আমার মাতৃভাষা; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের বুলির ও আমার সমস্ত রকম বর্নণা ভঙ্গির প্রকাশ ঘটে বাংলা ভাষায়। মাতৃভাষা ধর্মের অঙ্গ, এটা অস্বীকার করি না। কিন্তু একজন মুসলিম, জন্মের প্রথমেই ধরা বক্ষের ধুলি যখন স্পর্শ করে তখন তাকে আল কুরআনের ভাষা দ্বারাই অভিনন্দিত করা হয় এবং তা হলো আল্লাহ্র কালাম। আমার সর্বাঙ্গে, শিরায় উপশিরায় সৃজন ভোরের প্রথম এ কালামের ধ্বনি মরণ বেলা পর্যন্ত চেতনার বহ্নি

জ্বালাতে থাকে। সুতরাং এ ভাষার অমর্যাদা সহ্য করা, মুসলিম যারা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মুসলিম আমাদের পরিচয়। পক্ষান্তরে মাতৃভাষার গর্বে আমরা বাঙ্গালী নই, আমরা বাংলাদেশী। আবু জাহেলী ব্যাখ্যা অ ধর্মের বিদ্রুপ সমালচনার জবাব দানের নিমিত্ত জিহাদি গণ-মানুষ দল, উপদল ও সংগঠন সম্পৃক্ত ইসলাম দরদীরা পথে নেমেছে। দাউদ হায়দারের ন্যায় সব ধর্মবৈরী কুখ্যাতদের বিতাড়নই উপযুক্ত শিক্ষা নয়, দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি অবশ্যই দরকার।

এটা আঘাতের প্রত্যাঘাতদানকারী বাংলাদেশ, বীর প্রসবিনী দেশ, এখানে জন্মেছে বহু বীর-বীরাঙ্গনা। বিগত স্বাধীনতা ও সংহতি দিবসের কোন এক পর্বে জেনারেল আরোরা ও মুচকুন্দ দুবের আগমনকে রোধ করা হয়েছে। রোধকারী সকল সংগঠনকে জানাই মোবারকবাদ। সূর্য সেনের জন্মশত বার্ষিকী পালনের ভিতর দিয়ে দেশববাসীকে আমরা কি উপহার দিতে পেরেছি? এ সংগ্রামী নায়কের ধ্যান-ধারনায় ছিল ইংরেজ বিতাড়নের পর সমগ্র দেশটি হবে হিন্দুবাদের হিন্দু- ভারত, তাই নয় কি? ভারতবর্ষের মুসলমানগণও মানচিত্রের ন্যায্য অংশীদার, এ চিন্তার আলোকে তাঁর সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল কি? মুন্সী মেহের উল্লাহ, স্যার সলিমুল্লা, হাজী শরিয়ত উল্লাহ, সৈয়দ নিসার আলী (তিতুমীর) প্রমুখ আমাদের জাতীয় গৌরব ও

ভূষণ। এঁদের সম্পর্কে ফলাও করে তেমন কিছু তো করা হয় না। প্রজন্ম ধ্বংসের সবকিছুই শিখানো ও দেখান হচ্ছে, সে দিকে দেশের বুদ্ধিমানদের লক্ষ্য নেই। এ কথা মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ যে, এলেম সম্প্রদায় ইসলামী আকীদা অ ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় চেতনা সজীব রাখার প্রচেষ্টায় বিশেষ তৎপর বিধায় আমাদের ইজ্জত ও ঈমান এদেশে এখনও টিকে আছে। আমরা মুসলিম পরিচয়ে এখনও পরিচিত।

দারুন দুঃখে বলতে হয়, ইতিহাস সৃষ্টিকারী ও জগত বরেণ্য মুসলিম জাতির পতন ঘটাতে শত্রু পক্ষকে সব সময় পিছন দরজা ব্যবহার করতে হয়েছে। বন্ধুত্বের ভান করে, মত্রৈ স্থাপনের চিহ্ন হিসেবে মুসলিম রাজা-বাদশাহগণের ঘরে অবলীলাক্রমে তুলে দিয়েছেন অমুসলিম নারী। বীর জাতির স্বীয় কৃষ্টি ও আদর্শ বিনাসের এবং বির্য-বহ্নিতে চির ধরানোর এ এক অদ্ভুত কৌশলগত দিক ছিল। আজও সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বললে অত্যুক্তি হবে না, কালক্রমে ঐসব বাদশাহ ও প্রতিকী বেগমদের ঔরশজাত বা জন্মগত সন্তানরা পরম্পরায় ইসলামের ক্ষতি সাধন করার অপপ্রয়াসে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে; তাদের ধারাবাহিক উত্তর সুরীরাই আযানের ধ্বনিতে খুবই অস্বস্তি বোধ করে। নিদারুন ক্ষোভে বলতে হয়, বাদশাহ নামদারদের অদূরদর্শি স্ফূর্তির মাশুল-আজকের এই পরিণতি। এদের আর কি দোষ।

মুসলমান ও মুসলিম দেশগুলি জেগেছে সত্য; কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। এর কারণ ধর্মীয় উপদেশ। অনুশীলন, স্বকীয় আদর্শ ও উন্নত সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিফলনে Cconcession (কাট-ছাট) নিতি গ্রহণের কারণে মুসলমানগণ বর্তমান দুনিয়ায় নাস্তানাবুদী ও দুর্বিসহ পরিবেশে অত্যন্ত বিহবল চিত্তে জীবন অতিবাহিত করছে। এর থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো চলমান জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সর্বক্ষেত্রে ইসলামী বিধি বিধান পরিপূর্ণরুপে মেনে চলা; দ্বীনের শত্রুর মোকাবেলা করা। জাতি বিনাসের মারাত্বক অস্ত্র হলো সংশ্লিষ্ট জাতির আদর্শের বিলোপ সাধন, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটান। বাংলাদেশে আজ তাই শুরু হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, স্কুল/কলেজের পাঠ্য পুস্তকে গোশতের পরিবর্তে মাংস, সুরুয়া বা ছালুনের স্থলে ঝোল, হালাল পশু জবেহর পরিবর্তে মারা বা কাটা, অনেক যায়গায় পানির স্থলে জল ইত্যাদি বিজাতীয় সংস্কৃতিক শব্দের ছড়াছড়ি। শিক্ষাঙ্গণ ত্যাগের পর মুসলিম ছেলেরা এই সব শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগ দ্বারা খাটি বাঙ্গালীর পরিচয় দান করছে। সমাজ আর কি আশা করে? ত্রুটি কাদের? ইংরেজী বইতে তো ‘আল্লাহ্র’ পরিবর্তে ‘গড’ (Dod) শব্দের ছড়াছড়ি। আল্লাহ্ ও গড কি এক অর্থবোধক? এরূপ আরো কতকি! বিবাহের কার্ডে

(মুসলমানদের) ‘বিসমিল্লাহর’ উপরে থাকে প্রজাপতি, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি অশ্লিল ছবি। সুড়ঙ্গ পথের প্রক্রিয়ায় নতুন প্রজন্মের মন-মজ্জায় ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে। বহু উচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তি সভা- সমিতিতে বক্তৃতার মাঝে মধ্যে ‘গড’ শব্দ ব্যবহার করে মুসলিমানিত্ব রক্ষা করতে চাহেন। আমরা অবুঝ (?) তাই হাসি পায় এদের Concession নীতি দেখে। সমাজের উচ্চ স্তরের ধর্মীয় বা শরীয়তের দৃষ্টিতে এরা নিম্ন স্তরের। কোমলমতি ছেলেরা মাথায় এক ধরনের হ্যাট পরিধান করে। কিন্তু টুপি পরে না। এই টুপির গায়ে ‘আল্লাহ্’ বা অন্য ইসলামী কৃষ্টিমূলক শব্দ লেখা থাকে না, থাকে ম্যারাডোনার ছবি। অভিভাবকগণ গভীর তত্ত্বের দিকে একটুও খেয়াল করেন না। আফসোস! ‘সুড়ঙ্গ পথ’ কি চমৎকার বাজার তৈরী করে চলেছে!! এ ছেলেরাই বড় হয়ে কবীর চৌধুরী গং হবে নয় কি? আযান না রবীন্দ্র সঙ্গিত-কোনটি ভাল লাগার আশা করেন এ ছেলেদের কাছ থেকে পরবর্তী অধ্যায়ে। আজকের ম্যারাডোনা মুখীরাই আগামি দিনের শরীফ গং হবে। সুতরাং তসলিমা গংদের অশুভ আক্রমণের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন যেন স্তমিত না হয়ে যায় সফলতা লাভের পূর্বে। ইসলামী চিন্তা- ভাবনার ও আদর্শের ব্যক্তিক্রম ধারণাই পতনের উৎস।

উপসংহারঃ সুড়ঙ্গ পথের সকল অপতৎপরতা বন্ধ করা একান্ত জরুরী ; এ পথের গুরুত্ব এত তুচ্ছ ভাববার কারণে দেশময় ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে , যোশী বাহিনী (ভারতীয় সেনা প্রধান জেনারেল বি , পি, যোশী) এটাই চাচ্ছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের মুসলিম সরকারের রাহুমুক্তি ঘটুক এই-ই প্রত্যাশা।

****

বিশেষ নিবন্ধ

ইউরোপে মুসলিম প্রজন্মের ভবিষ্যত

মাওলানা ইসমাঈল ইউসুফ

সৃষ্টির প্রথম হতে মানুষ পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করা ও সন্তানের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের বাড়ী ছেড়ে দুরদুরান্তে , দেশ বিদেশে ও বিভিন্ন শহর বন্দরে অজানা প্রান্তরের পানে ছুটে বেড়িয়েছেন। ভিন দেশের অচিন পরিবেশ থেকে সম্পদ আহরণ করেছে।

ইউরোপ আমেরিকা তথা পশ্চিমের ধন দৌলতের হাতছানি বাংলা পাক ভারত তথা পূর্ব এশিয়ার লোকদের আজও আকুল করে এবং তারা বাড়ীঘর, আত্মীয় পরিজনের মায়া ত্যাগ করে বিদেশ বিভূয়ে পাড়ি জমায়। ইউরোপ আমেরিকা অ পাশ্চাত্যে গিয়ে একজন মানুষ ধনবান ও সম্পদশালী হয়ে পেটের আগুন নিভাতে পারে বটে কিন্তু ধর্মহীনতা, নির্লজ্জতা ও চারিত্রিক লাম্পট্যের লেলিহান শিখা তাঁর পার্থিব পবিত্রতা ভস্ম করে দেয়। কোন ভাবে সে নিজে এ থেকে অক্ষত থাকলেও তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম এ আগুন থেকে আত্মরক্ষা করতে অক্ষম থাকে। যে সন্তানদের নিরাপদ ও উন্নত ভবিষ্যতের আশায় সে স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে প্রবাসের দুঃখ যাতনা মাথা পেতে নিয়েছিল, মানবিকতা ও ধার্মিকতার মানদণ্ডে তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় দেখতে পেয়ে সে অনুতাপ অনুশোচনার আগুন দগ্ধ হতে থাকে।

জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কুরাইশী
বিশ বছর যাবৎ লণ্ডনের বাসিন্দা। তিনি সেখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন বহুদিন। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গুলো তিনি তার স্বরচিত গ্রন্থ ‘ইউরোপকে মুসলমান কি আয়েন্দা নসলূকা মুকাদ্দার’ (ইউরোপে মুসলিম অনাগত প্রজন্মের ভাগ্যলিপি)-এ এর বিশদ আলোচনা করেছেন। এশিয়ান মুসলমানদের মধ্যে যারা ইউরোপ ও আমাএরিকার অর্থনৈতিক

সমৃদ্ধির হাতছানিতে মোহিত হয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন এ গ্রন্থটি তাদের জন্য পথের দিশা হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, এ গ্রন্থটি পাঠ করে অনেক পাঠকই লজ্জা-শরম, চরিত্র ও ধার্মিকতা রক্ষার সদিচ্ছায় সেখানে যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করবেন।

জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কুরাইশী লণ্ডনের একটি দ্বীনী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি লণ্ডনের একটি কেন্দ্রীয় মসজিদের উর্ধ্বতন ট্রাস্টী। এছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী। বিগত দশ বছর যাবৎ তিনি শিশু কিশোরদের ধর্মীয় শিক্ষা দানে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। সম্মানিত পাঠকবর্গের নিকট উক্ত বইয়ের সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হলোঃ

এক অভিনব অরণ্যঃ

আধুনিক ইউরোপের সুউচ্চ ভবনগুলো যেখানে মানবিক মূল্যবোধ আত্মহুতি দিয়ে চলছে। ইউরোপিয়ানরা নিজেরাই একে Concretc Jungle নামে অভিহিত করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইউরোপ এমন এক অরণ্য যেখানে মানব সমাজের জন্য আইন জারী করে রাখা হয়েছে মাত্র। পক্ষান্তরে তৃতীয় বিশ্বের এক কালের বৃটিশ উপনিবেশ গুলিতে মানুষের জন্য জংগল ও বর্বর আইন জারী করে রাখা হয়েছিলো।

বনাঞ্চলের কতগুলো বৈশিষ্ট রয়েছে।
সেখানে পদে পদে বিপদাপদ ওঁৎ পেতে থাকে।
সর্বদা এক আসংকা ও রহস্যময়তা বিরাজ করে। ঘন গাছপালার মাঝে কোথাও থাকে কাঁদা মাটির গভীর ডবার ফাঁদ। গভীর জংগলে পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন এক সমস্যা, গন্তব্যের পৌওছার পথ পাওয়া দুষ্কর। ইউরোপের এই অভিনব অরণ্যে উলংগপনা ও অশ্লীলতা এমন মানবতা খেকো আনন্দ যা সর্বদা তার মুখ গহবর খুলে রেখে শিকারের তালাশে থাবা বিস্তার করে রয়েছে। সুযোগ পাওয়া মাত্র শিকারকে গিলে ফেলাই তার কাজ। অশ্লীলতা ও উলংগপ্নার বিষাক্ত দংশনে দংশিতার সর্পদংশিতের ন্যায় পানি পানি করে কাতরায় না। বরং তারা পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে ফেলে দিয়ে উন্মাদের ন্যায় ছুটতে থাকে রাস্তায়। একবার কেউ পা ফসকে যৌন যথেচ্ছাচারের চোরাবালিতে পড়ে গেলে তার আর উঠে আসার কোন উপায় নেই এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাহীন এই দেশে সে ক্রমান্বয়ে অতলেই তলিয়ে যাবে।

ফলতঃ এখানকার অধিবাসীরা মদে বুঁদ হয়ে বিবস্ত্র থাকার আগ্রহ চরম উদগ্রীব। এখানকার বেনিয়া পোদ্দাররাও মুখের মধুমাখা ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের শিকারকে ঘায়েল করে এবং শিকার তড়পাতে তড়পাতে নির্জীব হয়ে যায়। এখানের পথচারীরা নিত্যদিন পথ হারায়। বিশেষত শিশু-কিশোররা এমন ভাবে হারিয়ে যায় যে তাদের কোন সন্ধানই

পাওয়া যায় না। আমারা জানি, পশুরা তাদের ছোট সন্তানদের কাছে কোন কিছু ঘেষতে দেয় না। সন্তানকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তারা যে কোন বড় ভয়ংকর শত্রুর মুকাবেলা করতে ও নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিনষ্ট করতে প্রস্তুত। কিন্তু পশু শাবকগুলো একটু সেয়ানা হয়ে উঠলেই তাদের জনক-জননীই তাদের দূরে তাড়িয়ে অরণ্য শিশু বয়সে সন্তানরা অপরিসীম রক্ষণা-বেক্ষণের সুযোগ পেয়ে থাকে। শিশু একটু সেয়ানা হলেই তারা অবাধ বিচরণের স্বাধীণতা পেয়ে যায় এবং তখন তাদের জন্য যা ইচ্ছা তাই ক্রা, খাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়ে যায়।

ইউরোপের এ নতুন মানব অরণ্যের মানুষেরা পশুর ন্যায় উলংগ যৌনাচারে লিপ্ত হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এতে আত্মীয়তার পবিত্র সম্বন্ধের কোন মূল্য দেয়া হয়না। যেন এরা সাক্ষাৎ ইতর হায়ওয়ান-জানোয়ার। আর এতে আশ্চর্যেরই বা কি যে, শুকর অবৈধ যৌনাচারে জন্য সর্বজনবিদিত। যদি সেই শুকরই তাদের মাঝে সংক্রামিত হওয়া কোন বিচিত্র কিছু নয়।

শিশুরা এটা শিখে তাদের (Child Abusc) পিতা মাতা ও অভিবাবকদের কাছে। এ হলো পাশ্চাত্যের ঘৃণ্য বাস্তবতা। অসংখ্য কুমারী মাতা প্রতি তিনটি নবজাতকের একটি পিতৃ পরিচয় হীন, জারজ সন্তান। সদ্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি দুইজন

নবজাতকের একটি অবৈধ। সামরিক স্ত্রী বিনিময়, রুচি বদলের জন্য বউ বদল, (Wife Swapping) বিয়ে করা দম্পতির অবৈধ প্রেম চর্চা, সমশ্রেণীর (পুরুষে পুরুষে ও নারীতে নারীতে) বিয়ে এবং বর্তমানে তার আইনগত বৈধতা। সমশ্রেণির বিয়ের ব্যাপারটা এখন সেকেলে। আধুনিকতা হল পুরুষে সন্তান ধারণ ও প্রসবের শখ। (Child Pronogranphy) সুইজারল্যাণ্ডে ১৩ বছরের অধিক বয়স্ক কিশোরীদের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বৈধতা যথেষ্ট হয়নি বিধায় এক লাখ চৌরাশি হাজার অভিভাবকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রের ভাষ্য ছিল ১৩ বছরের কিশোরীদের গর্ভধারণ বৈধতা প্রদান। (সৌজন্যে দৈনিক জং পাকিস্তান)

লণ্ডনের একটি ব্যস্ততম বাণিজ্যিক কেন্দ্রে চলে ‘উলংগ সংগম’। এক সময় তা ছিল পশুর কাজ, আর এখন…… পাঠক মাফ করবেন, কলমের সংযম বাধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। অন্যথায় এ সম্পর্কে লিখবার বিষয়তো অঢেল। মানুষের স্বভাবে জন্মগতভাবেই এমন সব উপাদান রয়েছে যে, সে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সংসর্গ দ্বারা আচার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়।

উপমহাদেশের একটি বাস্তব ঘটনা দিয়ে দৃষ্টান্ত পেশ করছি। একবার এক নেকড়ে বাঘ গ্রাম থেকে একটি শিশু নিয়ে গেল এবং অজ্ঞাত ও বিস্ময়কর কোন কারণে বন্য পশু নিয়মের বিপরীতে সে শিশুটিকে না খেয়ে নিজের

বাচ্চাদের সাথে লালন পালন করতে লাগলো। একদিন এক শিকারীর গুলিতে সে মানব নেকড়েটি আহত ও বন্দী হল। চিকিৎসার জন্য তাকে বোম্বাইয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আঘাত মারাত্মক হওয়ার কারণে তাকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসকের চেষ্টা সফল হল না। হাসপাতালের লোকেরা তার নাম রেখেছিলো ‘রাম নেকড়ের ছানা’। পত্র পত্রিকায় তার ছবি ও কাহিনি ছাপা হয়েছিলো। নেকড়ের মত তার স্বভাব ছিলো কাউকে কাছে পেলে কামড়ে ধরতো। চতুষ্পদ চযন্তুর মত হাটতো। কাঁচা গোশত খেতে এবং নেকড়ে বাঘের ন্যায় আওয়াজও করতো।

শিশু যে কী পরিমাণ তার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় এ সম্পর্কে এর চেয়ে পরিষ্কার দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই। জ্ঞানীগণ ও পণ্ডীতবর্গ শিশুকে তরল পদার্থ (Liguid) এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থ্যাৎ তা যে পাত্রে রাখা হবে তারই রং ধারন করবে। শিশুদের সাদা কাগজও বলা হয়েছে অর্থ্যাৎ তাতে যা ইচ্ছা তা লিখে অ একে দেখা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, নরম বৃক্ষ শাখার ন্যায়, যেদিকে ইচ্ছা মোড়ানো, ঘুরানো যায়। শিশু হৃদয়ে পরিবেশের প্রতিচ্ছবি পাথরে খোদাইয়ের ন্যায়। যা কখনো মুছে যায় না। বিশেষতঃ ইউরোপের জন্মগ্রহণকারী শিশুরা পরিবেশের প্রতিক্রিয়া গ্রহণের প্রবল স্বাভাবশক্তি নিয়ে জন্ম নেয়।

মুসলমান শিশুরা ইউরোপের তথাকথিত
মুক্ত পরিবেশে যে ভাবে নেশা, চুরি, অবৈধ যৌনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হয় যা অবিভাবকদের জন্য দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। সে জন্য তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করার কোনই উপায় নেই। আমরাই তাদেরকে ওই মানব নেকড়ে ছানার মত জংগলে প্রতিপালিত হতে ছেড়ে দিয়েছি। এখন যদি তারা পশুর ন্যায় আচরণ করে, উলংগ নৃত্য করে কিংব কাউকে আঘাত করতে উদ্যত হয় তবে তাদের অপরাধ কি?

পাশ্চাত্যের উলংগপনা, নির্লজ্জতা ও অবাধ যৌনতা তাদের অপক্কবুদ্ধি ও মেধাকে মারাত্মকভাবে বিগড়ে দিচ্ছে। অবাধ যৌন সম্ভোগের কারণে তারা ঘর ও পিতা মাতার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকতে চায়। গার্ল ফ্রেণ্ড ও বয় ফ্রেন্ড রাখা তাদের দৃষ্টিতে একটি স্বাভাবিক ও গ্রহনযোগ্য সামাজিকতা।

আচ্ছা বলুন, আমরা আমাদের সন্তানদের মুসলমান বানাবার জন্য এবং তাদের ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য কী চেষ্টা তদবীর করেছি! আমরা তো এতো ব্যস্ত থাকি যে, তাদের সাথে আলাপ আলোচনার করার জন্যও এতটুকু সময় বের করতে পারি না। আমাদের একমাত্র লখ্য ছিল্য অধিক হতে অধিক পাউণ্ড ডলার উপার্জন করা এবং তা সে সন্তানদের জন্যই যারা আজ আমাদের কথা এ কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে

দেয়। আমরা আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানদের কখনো কাছে বসিয়ে দু’টি নীতি কথা বলার সুযোগ ক্রতে পারিনি, আমরা সময় করতে পারিনি। আমরা পারিনি তাদের মানুষ হওয়ার কোন বাস্তব পাঠ দেয়ার। তাদের একমাত্র কাজ টি,ভির প্রোগ্রাম দেখা এবং ডাইনিং টেবিলে খানা খেয়ে অন্য কামরায় চলে যাওয়া। তাদের সঙ্গে আমাদের মানসিক সংযোগ ঘটেনি কোন দিন। ভুক্তভোগীরা লক্ষ্য করে থাকবেন, পরিবারে কোন আত্মীয় অতিথি এলে আমাদের সন্তানরা তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা এড়িয়ে যায়। অথচ তারাই সমবয়সীদের সাথে আড্ডা মেরে রাত কাবার করে দেয়। আমরা তাদের জন্য সর্বাংশে যা করেছি তা হল স্কুলের সময়ের পর মসজিদের বা (সাপ্তাহিক ছুটির দিনে) মাদরাসায় পাঠিয়েছি। কুরআন শরীফ বা মাতৃভাষায় দু এক হরফ পাঠের উদ্দেশ্যে। আমরা এই ভেবে আনন্দিত হয়েছি যে, বাচ্চারা তো বেশ মাদরাসায় মুসলমানী পাঠ পড়ছে। অথচ বাচ্চারা শুধুই মা বাপের মনোবাসনা পুরণে এসব পাঠশালায় হাজিরা দিচ্ছে। অন্যথায় সাধারণ মসজিদ মাদরাসাগুলোতে তারা শিক্ষার পরিবেশ থেকে বঞ্চিত ছিলো। দিনের বেলা তারা যে স্কুলে যায়। সেখানে রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী ও শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ। শিক্ষকরা শিশু মনুস্তত্বে অভিজ্ঞ, পারদর্শী, শিশুরা সেখানে আনন্দিত, থাকে প্রফূল্ল। সেখানে তাদের জন্য এমন আকর্ষণ

রয়েছে যে, তাদের শরীর সুস্থ না থাকলেও তারা স্কুলে যাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করে।

পক্ষান্তরে মসজিদে শিক্ষকের আসন অলংকৃত করে আছেন সাধারণতঃ গম্ভীর হাবভাবের বয়স্ক মওলভী সাহেবগণ। যারা প্রায়শই ভালো ইংরেজী জানে না। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এক একজন হুযুরের জন্য ছাত্র সংখ্যা এত অধিক হয় যে, হুযুর তার ছাত্রদের সম্পর্কে ভালভাবে অবগতি লাভের বা তাদের আপন হওয়ার সময়-সুযোগই করতে পারেন না।

মসজিদের হাল-হাকিকত

বৃটেনের মসজিদ্গুলির অবস্থা প্রসংগে জনাব আব্দুল্লাহ কোরাইশী সাহেব লিখেছেন, বৃটেনের অনেক লোক তার সম্পূর্ণ বেতন মসজিদ-মাদ্রসার চাঁদার বাক্সে রেখে দিয়েছেন এবং মহিলারা তাদের প্রিয় স্বর্নালংকার খুলে দিয়েছেন। চাঁদা দেয়ায় শিক্ষকরাও পিছিয়ে থাকেনি। ব্যবসাজীবীরা তো মোটা অংক দান করেছেন। প্রথম দিকে যে কোন একখানা ঘর কিনে তাকে মসজিদ নাম দেয়া হতো। পরে যমীন খরিদ করে ঐতিহ্যময় গম্বুজ ও মিনার যুক্ত বিশাল মসজিদও তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র দেশে ৩৫ বছর সময়ের মধ্যে এখানে জন্ম গ্রহণকারী এশীয় সন্তাদের একজনও উল্লেখযোগ্য দ্বীনী আলিম হওয়ার কথা শোনা যায় নি।আমরা অন্যান্য বিদ্যা তাদের যথা নিয়মে শিখিয়েছি।

ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধু দীনী ইলমের ক্ষেত্রে।

চরম পরিতাপের বিষয় যে, পিতামাতা, অভিভাবক ও আলিমগণ এমন একটি অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

এখানে প্রথম পীর মুরীদীর ব্যবস্থা জমজমাট। পীর মুরীদীতে নযর-নেয়ায হাদীয়া তোহফা দেয়ার প্রচলিত নিয়ম তো রয়েছেই। পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং জনসেবার নামে পীরের দরবারে লংগর খানা চালাবার ব্যবস্থা তো আছেই। এতে অর্থকড়ির উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হয়ে যায়। বিষয়টি অনেকের জন্য বড় ধরনের আকর্ষণ ও দুর্বলতার কারণ হয়েছে। যার ফলে অনেক সময় এমন দেখা গিয়েছে যে, জনগণের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য উপমহাদেশ হতে কোন একজন খাটি পীর বুযুর্গের আগমণ ঘটলে তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে দুজন বহুরূপী ভন্ডও এসে উপস্থিত হয়। যারা হিথরো বিমান বন্দরে নেমেই ‘পীর’ এর ব্যাজ লাগিয়ে নগরীতে ঢোকে এবং সরল প্রকৃতির মুসলমানদের জান,মাল ও ইযযত আবরু দু’হাতে লুটতে থাকে। এধরণের হহুরূপীরা মুসলমানদের জন্য অনেক বদনাম কুড়িয়েছে। এরা অনেক হাসির খোরাক যুগিয়ে বিশ্বে নিন্দিত হয়েছে।

স্কুল-বিদ্যালয়ের খবরাখবর

লেখক বৃটেনের স্কুলগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যিক্ত রাজ্যের (U.K) শিক্ষা ব্যবস্থায় এ লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে যে, শিশুরা তাদের শিক্ষা সমাপ্তির পর যেন বৃটেনের সুনাগরিক রূপে গড়ে উঠে। তারা যেন নিজেদের বৃটিশ (ইংরেজ) হওয়াতে গর্ববোধ করে এবং বিশ্বাসে খৃষ্টান হয়। আমাদের সরলমনা পিতা মাতাকে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সন্তানরা কালো বা গেরুয়া চামড়ার বৃটিশ। এ কারণের অধিকাং শিশু নিজেদের স্বদেশের পরিচয় দেয়া পছন্দ করে না। তারা মা বাপকে বলে, তোমরা এশীয়, আমরা বৃটিশ। স্কুলগুলিতে প্রতি দিনের প্রাতঃকালীন ঘন্টায় খ্রীস্ট ধর্ম মতে এসেম্বলীতে অংশ করতে হয়। (অবশ্য এসব এসেম্বলীতে কখনো কখনো সাধারণ জ্ঞানের পরিচয়ে অন্যান্য ধর্মের আলোচনাও হয়ে থাকে।) কেননা রাষ্ট্রের ধর্ম খৃস্টবাদ।

পরবর্তী ঘন্টা অবশ্যাম্ভিরূপে ধর্ম শিক্ষার ঘন্টা। এতে রীতিমাফিক খৃস্টবাদের শিক্ষা দেয়া হয়। তবে এ ঘন্তা হতে শিশুদের পৃথক রাখার অধিকার যে কোন পিতামাতার রয়েছে। এজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে একটি পত্র পাঠাতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ পিতামাতা তাদের সন্তানদের কি পড়ানো হচ্ছে তা লক্ষ্য করার প্রয়োজনই বোধ করে না। মুসলিম শিশুর সংখ্যা এক’শরও অধিক এমন একটি স্কুলে সন্ধান নিয়ে জানা গিয়েছে

যে, মাত্র দু ’জন অবিভাবক তাদের সন্তানদের খৃস্টবাদ শেখানোর ঘন্টা হতে পৃথক রাখার আবেদন করেছেন।

সেক্স এডুকেশনের ঘন্টা আবশ্যিক। প্রথম এ আইন বড়দের জন্য ছিল। এখন পাঁচ বছর হতে শুরু করার চিন্তা ভাবনা চলছে। যাতে আরো দ্রুত তাদের চরিত্রের বারোটা বাজতে পারে। কেননা ইংরেজ শিশুরা ৫ /৭ বছর বয়স হতেই বয় ফ্রেন্ড ও গার্ল ফ্রেন্ড এর চর্চা করতে শুরু করে এবং কোন শিশু তা না করলে তাকে স্বাভাবিক মনে করা হয় না। একটি জরীপ মতে বৃটেনের ১৪ বছর বয়সের কিশোরীদের শতকতা ৪০ ভাগ গর্ভবতী হয়ে থাকে (যদিও গর্ভপাত ঘতানো সহজ হওয়ার কারণে তারা সহজেই এ অপবাদ হয়ে মুক্তি পেয়ে যায়)।

এত অল্প বয়স থেকেই যৌন বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অবাঞ্চিত গর্ভধারন (un wanted pregnancies) প্রতিরোধ এবং এইডস এর ন্যায় দুরারোগ্য ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির প্রতিরোধ। মাদক দ্রব্যের বিস্তার ও সমকাম অভ্যস্ততার অভিশাপের কারণে এখানে এ ব্যাধিটি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। তাছাড়া ব্যাধিটি সংক্রামক (Contagious)-ও বটে।

নৃত্য ও সংগীতের ক্লাসও রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অর্ধ উলংগ হয়ে সাতারের (Swimming) প্রাকটিস। সাতার ও অন্যান্য ব্যায়ামের পর উলংগ ঝর্ণা -স্নান -এর ব্যবস্থাও রয়েছে।

(কোন পিতা মাতার অবিশ্বাস হলে নিজেদের সন্তানদের কাছে জেনে নিতে অথবা নিজেরা সুইমিং পুলে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন) কি মজার দৃশ্য। একই গোসলখানাইয় সব ন্যাংটা! (বানরের উত্তরসূরী বটে!)

শুরু থেকেই শিশুদের শিখিয়ে দেয়া হয়, কখনো মা বাপ মারলে যেন সাথে সাথে পুলিশকে জানানো হয়। এখন তো শিশুদের জন্য “টেলিফোনে চাইল্ড লাইন যুক্ত করা হয়েছে। ইংরেজ শিশুদের অবাধ যৌন সম্ভোগ ও জন সমক্ষে ছায়াছবি প্রদর্শনী আমাদের সন্তানদের জন্য জীবন সংহারী বিষতুল্য”।

যে সব শহরে আমাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সেখানে বহু মুসলিম কিশোর অমুসলিমদের সঙ্গে মিশে নেশা ও মাদকে অভ্যস্ত হয়ে Juinkies হয়ে গিয়েছে এবং নেশার পয়সা যোগাড়ের জন্য চুরি ছিনতাই করে থাকে।

বখাটে বলা এখন ছেলেদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ব্রেড ফোর্ট, বার্মিং হাম, ইস্ট লণ্ডন, সাউথ হল প্রভৃতি অঞ্চলে দুই সন্ত্রাসী যুদ্ধমান দল Gang Warfare এ লিপ্ত হয়ে ভাংচুর ও খুনাখুনি করে থাকে। পিতা মাতার সঙ্গে চিন্তার মিল না থাকার কারণে অধিকাংশ তরুন বিদ্রোহী ও অবাধ্য হচ্ছে। পরিবার ও বংশের কেন্দ্রীয়তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরা যেন পরিবারের সংঙ্গে তাল

মেলাতে পারছে না। মসজিদ ও সমাজেও তারা ফিট হতে পারছে না।

সমাজ অধিপতি ও শিশুর অভিভাবকদের দায়িত্বহীনতার ফলেই এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কামার ও রোজিনা লণ্ডনে উলংগ নৃত্য করার সময়ও আল্লাহু আকবার খচিত লকেট তাদের গলায় ঝুলছিল। আর নৃত্যের নামে যে আরও কতকি করা হয় তা শয়তানই ভালো জানে। আমাদের প্রবাসী সন্তানেরা ভারতীয় চিত্র জগতের যে কোন তারকা অভিনেতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল, কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের সামান্যও তারা জানে না।

খ্রীস্টান মিশনারী সমূহের তৎপরতা

খ্রীস্টান মিশনারী প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, খ্রীস্টান মিশনারীগুলো আমাদের, বিশেষত আমাদের সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গে লক্ষ্য রাখছে। এ বিষয়ে সুপরিকল্পিত তৎপরতা চলছে। বাইবেলের কপি উর্দু, বাংলা ও গুজরাটী ভাষায় ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া হচ্ছে। এদের তাবলিগ জমাত দুয়ারে এসে টোকা লাগায়, বেল বাজায়। Eastern Eyc নামের চলমান একটি কর্মসূচীর অধীনে প্রত্যন্ত অঞ্চলের (হিরো অঞ্চল) একটি ক্ষুদে খৃস্টান মিশনারীর দাবী, চার বছর মেয়াদে তারা ৫০ জন এশীয়কে খৃস্টান বানিয়েছে। এ সংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু এবং কতক শিখ ও মুসলমান। যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে একজন মুসলমানও

ছিলো।সে বর্তমানে একজন খ্রীস্টান মুবাল্লিগ (প্রচারক)। অথচ সে ভারতের একটি মুসলিম ধার্মীক পরিবারের সন্তান। কর্মসূচীতে অবশ্য একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, অন্যান্য ধর্মালম্বীদের তুলনায় মুসলমানদের খ্রীস্টান বানানো একটু কঠিন। তবুও কাজ অব্যাহত রয়েছে।

একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে প্রতিদিন ৭০ হাজার মানুষ খৃস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এ সংখ্যায় অতিশয়োক্তির কথা বাদ দিলেও একথা সন্দেহাতীত যে, খ্রীস্টবাদ প্রসারের মেহনত অব্যাহত রয়েছে। কোথাও দুর্ভিক্ষ বা বন্যা জলোচ্ছ্বাস দেখা দিলে সেখানে খ্রীস্টান মিশোনারীর বিভিন্ন সাহায্যকারী দল পৌছে যায় এবং মানুষের অভাব ও অপরাগতার সুযোগ সদ্ব্যবহার করে তাদের খ্রীস্টান বানানোর পায়তারা চালানো হয়।

এখনও পর্যন্ত মিশোনারী লোকদেরকে অর্থ ব্যয় করে কষ্ট সয়ে ভিন দেশে প্রবাস জীবন যাপন করতে হয়। আমাদের অসতর্কতা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে বসে যে, আমরা তাদের কাজ সহজ করে দিলাম। নিজেদের ঘরের কাছেই কাজের ক্ষেত্রে ও সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমরা মুসলিম সন্তানের রূপে বহু কাঁচা মাল (Raw Matcnial) তাদের হাতের কাছে এনে দিলাম। এখনো শামলাবার সময় আছে,

এখনো শুভ বুদ্ধির উদয় হলে মুক্তি আছে। নতুবা সামনে সমূহ বিপদ অপেক্ষা করছে।

****

আমার দেশের চালচিত্র

মুরতাদদের পক্ষে ওদের নির্লজ্জ দালালী এবং
কতিপয় লেখকের কুরআন হাদীস অপব্যাখ্যার ধৃষ্টটা !!

আমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায় ?
ফারুক হোসাইন খান
সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে কতিপয় কু-বুদ্ধিজীবী ধর্মদ্রোহী আইন পাশের বিরুদ্ধে ‘আদাজল’ খেয়ে দাপাদাপি, মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে। এ আইনের বিপক্ষে উদ্ভট যুক্তির সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে। তাদের যুক্তি তর্কের একটাই উদ্দেশ্য, এদেশে এ আইন পাশ করা যাবে না। এ আইন সাম্প্রদায়িক, খৃস্টানের কর্তৃক বর্বর যুগের প্রণীত। ইত্যাদি বে-আক্কেল ‘মার্কা’ আব্দার তুলে তারা ইসলাম ও ধর্ম চর্চার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য সমালোচনা করার ‘অধিকার’ নির্বিঘ্নে ভোগ করতে চাচ্ছে। এতার নাম নাকি মুক্ত বুদ্ধির অবাধ চর্চা। এ কুতর্কে দেশ, জাতি বা সমাজের লাভের বা উন্নতির ছিটোফোটা সম্ভাবনা নিহিত না থাকলেও তারা সকল আইন আদালতের উর্ধ্বে থেকে ধর্মের মুণ্ডপাত

এবং কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে আঘাত দেয়ার ‘যজ্ঞটি’ পালনে নানার বাড়ীর আব্দার জানাচ্ছে। এটা তাদের করতে না দিলে নাকি তাদের মানবাধিকার লংঘন করা হবে, তাদের প্রতি করা হবে মধ্যযুগীয় বর্বর আচরণ। এসব বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, কু-চিন্তায় পারদর্শিতা। অর্থ্যাৎ এরা কু-চিন্তা- চেতনায় এক একজন একেক রকমের বিশেষজ্ঞ। এজন্য এদের “কু-বাদী বুদ্ধিজীবী” ও বলা যেতে পারে। আমাদের গৃহপালিত বিশেষ হিংস্র প্রাণীটিকে আমরা যতই ঘৃণিত এবং নিকৃষ্ট মনে করি না কেন তার সাথে তুলনা করলে এসব পণ্ডিতদেরও মন হয় না। গৃহপালিত প্রাণিটি মনিবের বাড়ীতে চোর ঢুকলেও ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তদ্রূপ মনিবের হিতাকাংখী কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসলেও ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। অথ্যাৎ ভাল-মন্দ কোনটাই তার পছন্দ নয়। কিন্তু আমাদের কু-বাদী বিশেষজ্ঞরা ইসলামের স্বার্থ জড়িত কোন ভাল প্রস্তাবের কথা ইসলাম পন্থী কোন মহল থেকে ওঠলে বুঝুক আর না বুঝুক তার মধ্যে ‘কু’ অর্থ্যাৎ খারাপ আবিষ্কার করবেই। পক্ষান্তরে ইসলামের ওপর কোন আঘাত কোন মহল থেকে আসলে তাকে যেভাবেই হোক সমর্থন করবেই। অর্থ্যাৎ তারা ইসলামের কোন ভাল হলে তার বিপক্ষে আর খারাপ বা ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলে তা পক্ষে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কু-বাদীরা ‘জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শিক মুল্যবোধ

সুরক্ষা আইন’ পাশের দাবীতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের বিপক্ষে আবস্থান নেয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য উদ্ভট প্রচারণায় মেতে ওঠে। কু-বাদীরা চিহ্নিত পত্র পত্রিকায় এই দাবীর বিপক্ষে বিভিন্ন কায়দায়, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে এত কলাম, নিবন্ধের স্রোত বইয়ে দিয়েছে যে, তিক্ষ্ণ বিবেচনা বোধের অভাব থাকলে যে কোন ব্যক্তি বিভ্রান্তির এ মহাস্রোতে তলিয়ে যেতে বাধ্য। অথচ যুক্তির কষ্ঠিপাথরে এর প্রতিটি কলাম, নিবন্ধ বালখিল্য সুলভ এবং উদ্ভট কথামালা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম বিদ্বেষী এই কু-বাদীদের প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করতে গেলে মিনি-মহাগ্রন্থ রচনা ছাড়া উপায় নেই। তাই সে পথ পরিহার করে দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মূল হোতা ‘স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট’ তকমাধারী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় অন্যতম জধন্য ও ভিত্তিহীন প্রোপাগাণ্ডার স্বরূপ এখানে বিধৃত করা হল।

১। ধর্মদ্রোহী আইন পাশের বিপক্ষে ঐ পত্রিকা মারফত কয়েকজন আইনজীবির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মুল্যবান বয়ান পেয়েছি। এই আইনজীবী পালের অন্যতম হলেন তথাকথিত মৌলবাদ বিরোধী শক্তিমান ক্রসেডার প্রখ্যাত আইনব্যবসায়ী ডঃ কামাল হোসেনের মেয়ে ব্যরিষ্টার সারা হোসেন। তাদের সুরে সুরে মিলিয়ে প্রবন্ধ ফেদেছেন জাদরেল

বামপন্থী নেতা রাশেদ খান মেনন। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় হালুয়া রুটি উপার্জনকারী এটর্নি জেনারেল সাহেব এবং তার সহকর্মীও বিস্ময়কর ভাবে এ দলে ভিড়েছেন। তারা সবাই ধর্মদ্রোহী আইন পাশের বিরুদ্ধে ক্রসেড ঘোষণা করতে গিয়ে যা বলেছেন,তার সারমর্ম হল “এ আইন ইসলামী ভাবাদর্শ, মানবাধিকার ও সংবিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই আইন পাশ হলে দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। এই আইন পাশ হলে তা’ অপব্যবহার করে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার, শত্রুতা সাধন, হত্যা ও অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পথ বন্ধ হবে, ধর্মের প্রসঙ্গে কোন কথা বললেই তাকে অপব্যাখ্যা করে ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়া যাবে। এই আইন খৃস্ট জগতের এক অন্ধকার সময়ে প্রণীত। মধ্যযুগে খৃস্টান রাজা ও পাদ্রীরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখারা জন্য এই বর্বর আইন পাশ করেছিল। সুতরাং এ দেশে এই আইন পাশ হলে মোল্লারা পাদ্রীদের ন্যায় সংখ্যালঘু এবং সমাজের প্রগতিবাদীদের ওপর নির্যাতন চালাবে অর্থ্যাৎ এই এইন সাম্প্রদাইকতা ও সমাজ শোষণের হাতিয়ার হবে। সর্বোপরি এই আইন ইহুদী খৃস্টানদের প্রণীত। তাই এ আইন প্রতিহত করতে হবে। ইত্যাদি।“ [সূত্রের জন্য দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত

২৭,২৯,১৯,৩০শে জুলাই এবং ৫.৮.৪,১৫,১৭,১৯শে আগস্ট সংখ্যাসমূহে প্রকাশিত ব্লাসফেমী সংক্রান্ত নিবন্ধ ও বিবৃতিসমূহ দেখা যেতে পারে।]

তাদের উদ্ভট যুক্তি সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মদ্রোহী আইন যদি খৃস্ট জগতে অন্ধকার সময়ে এবং বর্বরতা করার জন্যই প্রণয়ন করা হয়ে থাকে তবে এই যুক্তি প্রদর্শনকারী আইনজীবী এবং বুদ্ধিজীবীরাও সেই বর্বর চরিত্রের পাদ্রীদের চেয়েও বর্বর এবং সাম্প্রদায়িক। কেননা গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে কথিত বৃটেন এবং সভ্য ইউরোপের আরও বহু দেশ এখনও এই বর্বর এবং অন্ধযুগের আইন নিজেদের সংবিধানে স্থান দিয়ে রেখেছে, বাতিল করেনি। অর্থ্যাৎ তারা এবং অন্ধযুগের আইন নিজেদের সংবিধানে স্থান দিয়ে রেখেছেন, বাতিল করেনি। অর্থ্যাৎ তারা বর্বরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদেরও বর্বর প্রমাণ করছে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানময় আধুনিক সভ্য যুগে সব কিছু জেনে শুনেও আমাদের গুণধর আইনজীবীরা সেই বর্বরদের তৈরী আইন শাস্ত্র অধ্যায়ন করেই আইনজীবী হয়েছেন, তারা সভ্য মানুষদের প্রণয়ন করা বিদ্যা অর্জন করেননি। অতএব জেনে শুনেও যারা বর্বর বিধ্যা অর্জন করেন তারা নিশ্চয়ই আরও নিকৃষ্ট বর্বর। এই বর্বর জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিরা যে অন্যান্য যুক্তি সমূহ ফেঁদেছেন তাও

বর্বরতা থেকে মুক্ত নয়। প্রথমত , এই আইনকে মানবাধিকার ও ইসলামী ভাবাদর্শের বিপক্ষে বলা হয়েছে। এই আইন ইসলামী আদর্শের পক্ষে না বিপক্ষে তা নিবন্ধের শেষে প্রমাণ করা হবে। তবে এ আইন কিভাবে মানবাধিকার লংঘন করবে তা ’ কিন্তু ওনারা বলেননি। অযৌক্তিকভাবে কোটি কোটি মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা , আল্লাহ্ ও রাসূল (ﷺ) কে কটাক্ষ করা মানবাধিকারের কোন সংজ্ঞায় পরে এতে করে জাতি ও দেশের কতখানি উন্নয়ন ঘটে তার একটা পরিসংখ্যান দিলে তারা ভালই করতেন। দ্বিতীয়তঃ ওনারা বলেছে , এই আইনের মাধ্যমে নাকি সাম্প্রদায়িকতা , সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন , ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার ও শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে।

উদাহরণ স্বরূপ প্রত্যেক নিবন্ধে পাকিস্তানের কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। অথচ ইংল্যাণ্ডে ব্লাসফেমীর আওতায় শুধুমাত্র খৃস্টধর্ম সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলমান , ইহুদী বা হিন্দুদের ধর্মের আদর্শ সুরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থ্যাৎ কোন সংখ্যালঘু খৃস্টধর্মের সমালোচনা করলে তাকে সাজা দেয়া যাবে অথচ কোন খৃস্টান সংখ্যালঘুদের ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করলেও তার কোন বিচার করা হবে না - আইন না থাকার অজুহাতে। ইংল্যান্ড কুখ্যাত ইসলাম বিদ্বেষী সালমান রুশদীকে আশ্রয় দিয়ে তার বিচার হওয়াকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

এটা ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমানদের প্রতি রাষ্ট্রীয় ভাবে মানবাধিকার লংঘনের একটা দৃষ্টান্ত বটে। কিন্তু এদেশের তথাকথিত মানবাধিকারের ‘পাণ্ডাদের’ দৃষ্টি সেদিকে যায় না। এদেশের ধর্মদ্রোহী আইন পাশের দাবীদাররা একমাত্র ইসলামের ওপর আঘাত হানা হলেও শুধু ইসলাম ধর্মের আদর্শ সুরক্ষার জন্য তারা এ আইন পাশের দাবী জানাননি। তারা সকল ধর্মের সুরক্ষার জন্য নয়া আইন পাশের দাবী জানিয়েছেন। ফলে বৃটেনে যেভাবে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লংঘিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে এ দেশে সে সুযোগ থাকার উপায় নেই। কিন্তু তার পরও কুবুদ্ধিজীবীরা এর মধ্যে ‘কূ’ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তারা এই আইনকে আগুন নিয়ে খেলা এবং একে সচেতন মানুষ মাত্রি প্রতিহত করার নসিহত করেছেন পাকিস্তানের ব্লাসফেমী আইনের কথিত কতিপয় অপব্যবহারের ঘটনাকে মূলধন করে। তাদের রেষারেষির ফলশ্রুতিতে কতিপয় শিক্ষক কর্তৃক একজন খৃস্টান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমীর অভিযোগ আনা এবং তাকে হত্যা করা। পানির কল নিয়ে এজ খৃস্টান ও তার মুসলমান প্রতিবেশীর ঝগড়ার ফলশ্রুতিতে ব্লাসফেমীর অভিযোগ এনে খৃস্টান প্রতিবেশীকে হয়রানি করা। এক দোকানীর সাথে এক খৃস্টানের লেনদেন সংক্রান্ত ঝগড়া এবং ব্লাসফেমীর মিথ্যা অভিযোগ এনে খৃস্টানকে আদালতে হাজির করা। এছাড়াও তারা উল্লেখ

করেছেন যে , পাকিস্তানের পুলিশ নাকি কথিত ধর্মান্ধদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমীর মিথ্যা মামলা ঠুকে দেয়। এ ছারাও প্রভাবশালী আমলা ও রাজনীতিকরাও নাকি প্রতিপক্ষকে জব্ধ করার জন্য এ আইনের অপব্যবহার করছে। অতপর এসব ঘটনার ফিরিস্তি দিয়ে যৌথভাবে ব্যরিষ্টার সারা হোসেন ও হাসান মির্জা সাহেব ১৭ জুলাই , জনকণ্ঠে প্রকাশিত তাদের নিবন্ধের এক স্থানে বলেছেন , ‘প্রস্তাবিত আইনটি এতই অনির্দিষ্ট যে, যে কোন বক্তব্যকে পবিত্র কুরআন ও নবী (□) সম্পর্কে অবমাননাকর বলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। অভিযোগকারীর খেয়াল খুশিকে এই আইন সহজেই প্রশ্রয় দেবে। “ তাদের এহেন অর্বাচীনের ন্যায় বক্তব্যে মনে হয় , এরা আইনজীবী দাবী করলেও আইনের ‘অ’ অক্ষরও জানেন না এবং আদালতের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধও এদের নেই। প্রথমত এরা যে আইনটিকে অনির্দিষ্ট এবং অভিযোগকারীর খেয়াল খুশি মাফিক ব্যবহারের আতঙ্কে ভুগছেন সেই আইনটি কিন্তু এখনও পাশতো দূরের কথা তৈরীও করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যুগোপযোগী একটি আইন প্রণয়নের দাবী জানানো হয়েছে মাত্র এবং যা ’ এখনও বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি তাকে ‘অনির্দিষ্ট ’ এবং ‘অপব্যবহারে ’ দোষে দোষী করা হল কোন উদ্দেশ্যে ? মাথায় কুচিন্তা ভর করলেই এমনটি হতে পারে। দ্বিতীয়ত , গুণধর

আইনজীবীরা আদালতের বিজ্ঞতার প্রতি ভয়ঙ্কর উক্তি করেছেন। এ আইনটি পাশ হলে নাকি প্রশ্রয় দেয়া হবে। এ আইনজীবীগণ কি মনে করেন, কোন বক্তব্য ধর্মের অবমাননাকর আর কনটা অবমাননাকর নয় আদালতের সে পার্থক্যটুকুও বোঝার মুরোদ নেই। বিচারকগণ যদি এতটুকু বিজ্ঞ না হন তবে তারা কিভাবে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ করে অপরাধীর বিচার করেন। তারা কি এতই পক্ষপাতের দোষে দোষী যে স্বাক্ষ-প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগকারীর অভিযোগ অনুযায়ী বিচার করে ফেলবেন? এই মতলববাজ আইন ব্যবসায়ীরা বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও একটি চটুল মন্তব্য করেছেন যা যে কোন মানুষের কৌতুক উদ্বেগ করতে যথেষ্ট বই কি। তারা বলেছেন, “এ আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা যাবে, শত্রু দমন এবং ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করা যাবে। অতএব এ আশঙ্কা দূর করার জন্য এ আইন প্রতিহত করতে হবে।” ওনারা ইসলাম বিরোধী ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কতখানি ছেলে মানুসি পারেন নি। বুঝতে পারেন নি, ওনাদের দাবী যে পুরো বিচার ব্যবস্থাকে অসার প্রমাণ করে, আইন ব্যবসাকেই একই অপরাধে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা জানি, আদালতে কোন অপরাধে প্রমাণ করতে স্বাক্ষী, স্বাক্ষ-প্রমাণের দরকার হয়। মিথ্যা সাক্ষী দাড় করিয়ে এবং বিজ্ঞ উকিলের যুক্তির তোরে কোন নিরীহ

ব্যক্তিকে যেমন ডাকাত প্রমাণ করা যায় আবার কুখ্যাত ডাকাতকে নির্দোষ প্রমাণ করাও সম্ভব। দেশে-বিদেশে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। তাই বলে এর দ্বারা আইনের এই যে অপব্যবহার হচ্ছে এর জন্য কি ডাকাতীর সাজা সংক্রান্ত বিধানটি তুলে দিতে হবে না এই আইনটি প্রতিহত করার জন্য উস্কানীমূলক নিবন্ধ ফাঁদতে হবে? যে আইনটি পাশ করার দাবী হচ্ছে সেটির আলোকে বিচারকরাই বিচার করবে অন্যান্য অপরাধের ন্যায় পুলিশি তদন্ত, স্বাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করেই। জনগণের নিজেদের হাতে আইন তুলে দিতে হবে বা তারা নিজেরাই যে বিচার করবে তাতো বলা হয়নি। বরং এমনটি কেউ করলে সে আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিধান করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। দু’একটি অপব্যবহারের ঘটনার আশঙ্কায় কোটি কোটি মানুষকে গুটিকতেক অপরাধীর শিকারে পরিণত করার রাস্তা খোলা রাখার জন্য সারা হোসেনরা ‘মালকোচা’ দিয়ে নেমেছেন কেন? বলি, উদ্দেশ্যটা কি?

(২) উক্ত পত্রিকার মাধ্যমে ধর্মদ্রোহী আইনের বিরুদ্ধে যারা কলমবাজী করেছেন তাদের মধ্যে আলেম খেতাবধারী ‘ত্রি-রত্ন’ও সামিল হয়েছেন। এরা কুরাআনের আয়াত, হাদীস উল্লেখ করে তাদের মতলবী যুক্তি পাকা করতেও কম কোশেশ করেননি। পূর্বে উল্লেখিত জনকণ্ঠের সংখ্যাসমূহে মাওলানা আব্দুল

আউয়াল, সাদ উল্লাহ ও হাফেজ জিয়াউল হাসান জিয়া প্রমুখের রচিত নিবন্ধ সমূহ পড়লে মনে হয়, ওনারাই যেন ইসলামের বিধি-বিধানের যুগশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার। যারা ধর্মের আদর্শ সুরক্ষার জন্য আইন পাশের দাবী করছেন তারা ওনাদের জ্ঞানের তুলনায় নস্যি। তারা আজীবন কুরআন, হাদীস চর্চা করে এখন কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করছে আর উনাদের ব্যাখ্যাই সর্বজনগ্রাহ্য। এই যুগশ্রেষ্ঠ (!) ব্যাখ্যাকার মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব ২৭শে জুলাই ‘ব্লাসফেমী খৃস্ট ধর্মযাজকদের ইসলাম বিরোধী আইন’ শিরোণামে এক বিশাল নিবন্ধের জন্ম দিয়েছেন। সাদ উল্লাহ সাহেবও ‘ইসলাম ও আমরা’ শিরোণামে প্রতি শুক্রবার মাওলানা সাহেবের সুর প্রতিধ্বনি করছেন সিরিজ নিবন্ধে। ইনিয়ে বিনিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে এরা বলতে চেয়েছেন যে, ব্লাসফেমী আইন ইহুদী- খৃস্টানদের প্রণীত, এটা ইসলাম বিরোধী। এই আইন প্রণয়ণের দাবি করে তথাকথিত ফতোয়াবাজরা ইহুদি-খৃস্টানদের অনুসরণ করছে। অতঃপর তাদের যুক্তিকে মজবুত করতে অবতারণা করছে একটি হাদীসঃ “শেষ যুগে আমার উম্মতের লোকেরা ইহুদী-খৃস্টানদের অনুসরণ করবে।“ মাওলানা সাহেবের মাথায়ও যদি কু- চিন্তা প্রশ্রয় নিতে না পারত তবে তিনিও জানতেন, তিনি যে সাম্প্রদায়িকতা মনে লালন করেন তার কোন স্থান ইসলামে নেই। ইসলাম ইসলাম মুসলমানদেরকে অমুসলিমিদেরও কোন

ভাল কাজকে গ্রহণ করতে বারণ করেনা। বাঁধা দেয় না। তা ছাড়া ব্লাসফেমী শব্দটাকে আমাদের দেশে ধর্মীয় আদর্শ সুরক্ষার উপযোগী আইন প্রণয়নের দাবী জানাতে ‘রূপক’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। যেহেতু ইংল্যাণ্ডে এ ধরণের আইন চালু আছে, উদাহরণ হিসেবে অনুরূপ আইন আমাদের দেশেও প্রণয়নের দাবী করা হয়েছে মাত্র, ইংল্যাণ্ডের ব্লাসফেমী আইনকে হুবহু গ্রহণ করার দাবী করা হয়নি। তাছাড়া এদেশের সকল ধর্মের আদর্শ সুরক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রণীত একমাত্র খৃস্টান ধর্মের আদর্শ সুরক্ষার ব্লাসফেমী আইন এদেশে চালু করার মত মুর্খের ন্যায় দাবি নিশ্চয় কেউ করেনি। কিন্তু তা জেনে শুনেও আউয়াল সাহেবরা এর মধ্যে ‘অনুসরণ করার’ মতলব আবিষ্কার করে ফেলেছেন। খুঁজে পেয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার রসদ। বেশ তো ব্লাসফেমী আইন ইহুদী, খৃস্টানদের মস্তিস্ক প্রসূত বলে এর অনুরূপ কোন আইন প্রণয়নও ইসলাম বিরোধী বলে আউয়াল সাহেবদের ন্যায় মহা ইসলাম দরদীরা যে বুঝতে পেরেছেন এজন্য তারা বাহবা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু ৯০% মুসলমানদের দেশের সংবিধানখানা যে প্রো-বৃটিশ সংবিধান, এ দেশের বিচার ব্যবস্থা যে ইহুদী-খৃস্টান ইংরেজদের প্রণীত আইন অনুযায়ী চলছে সে খবর কি আউয়াল সাহেবরা রাখেন? রাখলে ইসলামের এতবড় অবমাননা সহ্য করছেন কিভাবে? ইহুদী খৃস্টানদের এসব

জঞ্জাল সরিয়ে সবকিছু ইসলামী করণের জন্য হুঙ্কার ছাড়ছেন না কেন? আমাদের মত ইসলাম দরদীদের খৃস্টান আইনে শাসিত হওয়া কি শোভা পায়? তাও কিনা নীরবে মেনে নিচ্ছেন! ছিঃ মোনাফেকী হয়ে যাচ্ছে না! আসুন আজ থেকে খৃস্টান ইহুদীদের উদ্ভাবিত আইন শাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সবকিছু পরিত্যাগ করুন, জাতিকে পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে আন্দলন গড়েতুলুন। আমরা জানি, মানুষের ক্রোধে উন্মাদ হলে সাধারণ বিবেচনা বোধটুকুও হারিয়ে ফেলে, তখন সে প্রলাপ বকে। ধর্মদ্রোহী আইনের দাবীদারদের বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে কতিপয় ‘মাওলানা’ ও ‘হাফেজ’ খেতাবধারীরা তার কিছুটা প্রমাণ রেখেছেন বটে। তারা নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে দেশের গণ্যমান্য আলেম ও পীর মাশায়েখদের ক্ষমতালোভী এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্র হুশিয়ারী সংক্রান্ত আয়াতও উদ্ধৃত করেছেন। বলি, আলেমরা ক্ষমতালোভী হলো কোন যুক্তিতে, তারা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে কোন আন্দোলন করছে তারা কি রাজনৈতিক অবস্থাকে ঘোলাটে করার জন্য সংসদ অচল করে রেখেছে? যখন দেশে ঘন ঘন হরতাল ডেকে জনজীবনে দুর্ভোগ ডেকে আনা হয়, ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়া হয় তখন এসুব সমাজপ্রেমীগণ

কোথায় লুকিয়ে থাকেন ? কেন তখন আল্লাহ্র হুশিয়ারী বাণী তাদের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেন না ?

আউয়াল সাহেবরা কুরআন হাদীস এবং রাসূল (□)-এর জীবনীতিহাস নিয়েও ‘জঘন্য ’ একপেশে মন্তব্য করেছেন। ‘হাফেজ’ এবং ‘মাওলানার ’ দাবীদার হয়েও তারা কুরআন , হাদীস নিয়ে যে ঘৃণ্য খেলা খেলছেন তাতে মনে হয় , কুরান - হাদীসের অপব্যাখ্যা এবং কু -যুক্তিকে পাকাপোক্ত করতে কুরআনের আয়াত এবং হাদীস ব্যবহারের বিদ্যাটি তারা দক্ষতার সাথে রপ্ত করতে পেরেছেন বএই তাদের সমমনা লোকেরা সংশ্লিষ্ট বিদ্যায় তাদের ‘মাওলানা ’ ও ‘হাফেজ’ আখ্যা দিয়েছেন। তারা ধর্মদ্রোহীদের কোন শাস্তির বিধান কুরআন হাদীসে নেই বা রাসূল (□)-এর যুগেও এমন কোন ঘটনা ঘটেনি এটা প্রমাণ করতে গিয়েও আশ্রয় নিয়েছেন প্রতারণার ও ইতিহাস বিকৃতির। মুরতাদের শাস্তি আল্লাহ্ দেবেন , মানুষ তাদের বিচার করতে পারবে না। অর্থ্যাৎ মুরতাদকে জাগতিক কোন শাস্তি দেয়া যাবে না তা প্রমাণ করতে গিয়ে আব্দুল আউয়াল সাহেবরা যে কয়টি আয়াত উল্লেখ করেছেন তা ’ অপ্রাসঙ্গিক এবং স্বভাবগতভাবে চরম অপব্যাখ্যার সামিল। যে আয়াতে কাফিরদের সতর্ক করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্র হুশিয়ারী রয়েছে তাকে ব্যবহার করেছেন মুরতাদের প্রসঙ্গে। আবার যে আয়াত

মোনাফেকদের সতর্ক করে নাজিল হয়েছে তা ব্যবহার করেছেন মুরতাদদের প্রসঙ্গে। যেমন ধরা যাক। দৈনিক জনকণ্ঠে প্রাকাশিত মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেবের “মুরতাদদের শাস্তির নামে একাত্তরের বদলা নেয়ার পায়তারা” শিরোণামের প্রবন্ধটির কথা। [পত্রিকা কাটিংয়ের সময় ভুলবশত নিবন্ধ প্রকাশের তারিখ সংরক্ষণ করা হয়নি। সম্ভবত জুন মাসের শেষে অথবা জুলাইর প্রতমার্ধে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়।] নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে ৪টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এই লেখকেরই ২৭শে জুলাই-র আর এক নিবন্ধে উল্লেখিত আয়াতের ৩টি এবং নতুন দুটি আয়াতের উল্লেখ রয়েছে। আয়াতগুলি হল ২:২৫৬/ ১৮:২৯ / ১৬:২৯ / ৪:১৪০ / ৪:১৩৭ / ৬:১০৮। এই প্রত্যেকটি আয়াতের সুনিপুন ভাবে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা এখানে দু’টি নমুনা ধরছি। মাওলানা সাহেব প্রথম প্রবন্ধে সূরা নিসার ১৩৭ নং আয়াত, “যারা বিশ্বাস করে ও পরে সত্য প্রত্যাখ্যান করে অতঃপর তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না” উল্লেখ করেছেন। আয়াতের ভুমিকায় তিনি বলেছেন, “বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মগ্রহণ এবং বর্জনের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যাপার কোন প্রকার জোর জবরদস্তি নেই এবং জাগতিক শাস্তি ইসলাম অনুমোদন করে না, “পরে আয়াতের

ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, “কেউ একবার ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন অস্বীকার করলেই মুরতাদ হয়ে যায়। মুরতাদের জাগতিক শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ধার্য করা হলে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে একাধিকবার ধর্মগ্রহণ-বর্জনের যে অধিকার বা স্বাধীনতা আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছেন তা’ ক্ষুণ্ন হবে। ফতোয়াবাজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মুরতাদদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কুরআন বিরোধী দাবী কোন মুসলমানই মেনে নিতে পারে না।“ মাওলানা সাহেব এ অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুরতাদদের ধর্মদ্রোহী আচরণ করার অবাধ লাইসেন্স দেয়ারই ব্যর্থ কসরত করেছেন। আসল ঘটনা কিন্তু তা’ নয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আয়াতটি অভিশপ্ত ইহুদীদের সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমে তারা মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনে তারপর সত্য প্রত্যাখ্যান করে গো-পূজা করে কাফের হয়। অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান আনে। পুণরায় হযরত ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করে কুফরের চরম সীমায় উপনীত হয়। আয়াতের শেষে এই অভিশপ্ত ইহুদীদের ‘চরম কুফরের সীমায় পৌঁছার দরুন’ তাদের আর কখনও ক্ষমা বা সুপথ না দেখানোর আল্লাহ্র ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে। তা’ ছাড়া মাওলানা সাহেব তার ব্যাখ্যায় “উপরোক্ত আয়াতে একাধিকবার ধর্ম গ্রহণ বর্জনের যে অধিকার বা স্বাধীনতা আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছেন” বলে আবিষ্কার করেছেন তাও তার বিকৃত চিন্তা

চেতনার ফসল। এ আয়াতের মাধ্যমে মুরতাদদের বার বার ধর্ম গ্রহণের বা বর্জনের কোন অধিকার দেয়া হয়নি। বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ রাসূল (ﷺ)-কে ইহুদীদেরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে বলেছেন। তিনি যদি এর পরের আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি দিতেন তবে এ অপব্যাখ্যা করার দুঃসাহস হয়ত কিছুটা কম হত। পরের আয়াতেই বলা হয়েছে, "সেসব মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। "

মাওলানা সাহেব ২৭শে জুলাইর নিবন্ধের একস্থানে মন্তব্য করেছেন, "যারা ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ কিংবা আল্লাহ্র শাস্তি দেবেন। ইহজগতে এই অপরাধের বিচার করার অধিকার আল্লাহ্ কোন মানুষকে দেননি। " এর পর উল্লেখিত হয়েছে সূরা নিসার ১৪০ আয়াত, "যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্র কোন আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে তখন তোমরা এদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর, যতক্ষণ না তারা এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে ফিরে না আসে। অন্যথায় তোমরাও তাদের দলের বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্ মুনাফেক ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের দোজখে একত্র করবেন। " এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, "যারা ধর্মের নিন্দা বা আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে বিদ্রুপ করে তাদের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দিতে হবে। তবে সেটা সব

সময়ের জন্য নয়, শুধু নিন্দা বা বিদ্রুপকালীন সময়ের জন্য। এই সাময়িক মেলামেশা বন্ধ রাখাটাই উক্ত নিন্দাকারীর ও বিদ্রুপকারীর ইহজাগতিক শাস্তি। সেটাও আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন পরকালে তার শাস্তি হচ্ছে নরকবাস। “

এই আয়াতের আলোকে তিনি “শুধু নিন্দা বিদ্রুপকালীন সময়ে” সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বা মুরতাদের সাথে মেলামেশা বন্ধ রাখার একমাত্র ইহজাগতিক শাস্তির যে ফতোয়া ঘোষণা করেছেন এটাও তার একান্ত মনগড়া কথা। কেননা এই আয়াতটি নাজিল হওয়ার পটভূমি এবং মুল উদ্দেশ্যের সাথে মুরতাদ বা তাদের শাস্তির বিধানের কোনই সম্পর্ক নেই। অভিজ্ঞ তাফসিরকারগণের মতে , এ আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আনআমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে সূরায় মুসলমানদের কাফের ও বদকারদের ধারে কাছেও বসতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তিতে সে নিষেধ অমান্য করে কতিপয় মুসলিম নামধারী মুনাফিক মক্কার কুরাইশদের বড় বড় কাফের নেতাদের ইজ্জত সম্মানের মালিক মোখতার মনে করে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (􏰀)-এর মদীনা জীবনে আল্লাহ্ মুনাফিক ও মুসলমানদের সতর্ক করে কোন পরিস্থিতিতে কাফিরদের সাথে মেলামেশা বৈধ হবে তার নয়া রূপরেখা স্বরূপ এ আয়াত নাজিল করেন। এ আয়াত

মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে, কাফিরদের যে মজলিসে ইসলাম ধর্ম বা আল্লাহ্র কোন আয়াত নিয়ে বিদ্রুপ করা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এমন গর্হিত কাজ চলতে থাকে ততক্ষণ তাদের মজলিশে বসা বা যোগদান করা হারাম। যদি কেউ হৃষ্টচিত্তে সে মজলিশে উপস্থিত থাকে বা তাদের কুফরী কাজ পছন্দ করে তবে সেও কাফিরদের সমতুল্য বলে গণ্য হবে। অর্থ্যাৎ সে কাফিরদের সমান গনাহগার হবে এবং আয়াতের শেষের অংশে বলা হয়েছে, জাহান্নামে কাফিরদের সাথেই তাদের একত্রিত করা হবে।‘ আয়াতের শেষের অংশে আরবী শব্দ ‘মুনাফিকিনা’ এবং ‘কাফিরিনা’ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ মাওলানা সাহেব তার অনুবাদে ‘মোনাফেক’ এবং ‘সত্য প্রত্যাখ্যানকারী’ উল্লেখ করে মোনাফেকদের সাথে মুরতাদদের জাহান্নামে একত্রিত করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অথচ আয়াতে ‘কাফির’ শব্দ ব্যবহার করে জাহান্নামে মক্কার কুরাইশ কাফেরদের নেতাদের (যারা কখনই ইসলাম গ্রহণ করেনি, যাদের বেলায় মুরতাদ হওয়া প্রশ্নই অবান্তর) ন্যায় কাফেরদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে মুনাফিক হিসেবে গণ্য মুখোশধারী মুসলমানদের একত্রে শান্তি দেয়ার সতর্কবাণী উল্লেখিত হয়েছে। অথচ, তিনি এ স্পষ্ট আয়াতটিকে অপব্যবহার করলেন মুরতাদের রক্ষা কব্জ হিসেবে। এমনি করে

তিনি উল্লেখিত সবক ’টি আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছেন মুরতাদদের রক্ষা কবজ হিসেবে। এর পরই তিনি বিশিষ্ট সাহাবীগণের দ্বারা বর্ণিত মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কিত সকল হাফদীস অস্বীকার করার ধৃষ্টটা দেখান। তিনি স্বপক্ষে যুক্তি দেখান যে , এগুলি উহুদীদের দ্বারা রচিত জাল হাদীস এবং কুরআনের মুল নীতির সাথে সম্পর্কহীন এবং বিরোধী। অথচ মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে , হযরত মুহাম্মদ () বলেছেন যে , “যে ধর্মত্যাগ করে তাকে হত্যা কর অথবা তার শিরোচ্ছেদ কর। “ এ হাদীসটি প্রধান প্রধান সকল হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। যেমন, বুখারী বুর্তাদ্দীন অধ্যায় , আবূ দাউদ , হুদদ পধ্যায় , নাসাই , তাহরী মুদদাম অধ্যায় , মুয়াত্তা ইমাম মালিক আকদিয়্যা হাদীস -১৫, তিরমিজী , হুদুদ অধ্যায়। এই ভণ্ড মাওলানা এখানে ক্ষান্ত না দিয়ে ইসলামের ইতিহাসেও বিকৃতি ঘটিয়েছেন। নিবন্ধের শেষে কতিপয় ঘটনার বিকৃত উপস্থাপনা করে তিনি বলেতে চেয়েছেন যে, রাসূল ()-এর জীবনে মুরতাদদের শাস্তি প্রদানের কোন প্রমাণ নেই। তিনি বয়ান করেছেন যে , আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ নামে এক অহি লেখক মুরতাদ হয়ে গেলে মহানবী () তাকে কোন শাস্তি দেননি এবং মুসাইলামা কাজ্জাব মিথ্যা নবীর দাবী করে মুরতাদ হয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি।

কতিপয় বখাটে আলেমের কাছে প্রমাণ না থাকলে কি হবে , ইসলামের ইতিহাসতো আর বিলীন হয়ে যায়নি। আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ নামক অহি লেখক মুরতাদ হয়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গিয়েছিল আর মুসাইলামা কাজ্জাব মিথ্যা নবুয়তের দাবী করেন রাসূল (-)-এর শেষ জীবনে। তাই সরাসরি তার পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই তিনি ওফাত পান। প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হয়েই সর্ব প্রথম কাজ্জাবসহ মিথ্যা নবীর দাবীদার এবং যাকাত অস্বীকারকারী সকলকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে জিহাদ ঘোষণা করে তাদের নির্মূল করেন। রাসূল (-) মক্কা বিজয়ের পর বড় বড় কাফের নেতাদের ক্ষমা করে দিলেও ৪ ব্যক্তিকে ক্ষমা না করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। এর মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন খাতাল ছিলেন মুরতাদ হওয়ার অপরাধে অপরাধী। সে এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং একজন মুসলমান খাদেমকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে যায়। বুখারী শরীফ এবং আবু দাউদ শরীফেও ঘটনাটি উল্লেখ আছে। এছাড়া আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে দু ’টি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে , যে (১) ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বাহ্যত পরাজয় ঘটলে জৈনকা হতভাগা নারী নিজেকে মুরতাদ ঘোষণা দেয়। মহানবী (-) এ সংবাদ শুনে সাহাবীদের নির্দেশ দেন , “তোমরা উক্ত ধর্মত্যাগী মহিলাকে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার আহবান

জানাও। যদি সে তোমাদের আহবান প্রত্যাখ্যা করে তবে তাকে হত্যা কর। “

(২) উম্মে রুম্মান নামে এ মহিলা নিজেকে মুরতাদ বলে ঘোষণা দেয়। মহানবী সাহাবীদের তাকে ইসলামে ফিরে আসার আহবান জানানোর নির্দেশ দেন। ঐ মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করলে রাসূল (ﷺ) তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। “

এছাড়াও ইতিহাসের পাতায় খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বহু মুরতাদের শাস্তির কথা বিধৃত রয়েছে। মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে প্রসিদ্ধ চার ইমামের সকলেই মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। এ ছাড়া মুরতাদদের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্র যে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যা ’ আব্দুল আউয়াল সাহেবরা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তা ’ হলঃ

(১) “যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত আর ভু -পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের সাজা এই যে , তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে। .... [সূরা মায়েদা , ৩৩ আয়াত]”

হিজরী ষষ্ঠ বর্ষে ‘ওয়াইনা ’ গোত্রের কতিপয় লোক রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের শাস্তির বিধান স্বরূপ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। অধীকাংশ তাফসীর ও হাদীস

গ্রন্থে তাদের মুরতাদ হওয়ার বিস্তারিত বিবরণসহ রাসূল (□)-ও এ ঘটনা তার বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে 'মুরতাদের আহকাম' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিখ্যাত সাহাবী হযরত সাইদ বিন জুবায়ের (রাঃ)-এর মতামত পেশ করেন যে, আয়াতে উল্লেখিত 'মহারাবা' বা আল্লাহ্র সাথে সংগ্রাম করার অর্থ হল কাফির বা মুরতাদ হওয়া।

(২) "অতপর তোমাদের কি হল যে, মনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে ......। অতএব তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করে আসে। অতপর তারা যদি বিমুখ হয়ে যায় তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করও না এবং সাহায্যকারী বানিয়ো না। [সূরা নিসা, ৮৮-৮৯ আয়াত]"

মুজাহিদ (রাহঃ) থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ (রাহঃ) বর্ণনা করে যে, একবার কতিপয় মুশরেক মক্কা থেকে মদিনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান, হিজরত করে এসেছে। কিছুদিন পর তারা মুরতাদ হয়ে যায় এবং পণ্য দেওব্য আনার অজুহাতে পুনরায় মক্কায় ফিরে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। সেদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কেউ বলল, এরা কাফের আবার জেউ বলল মু'মিন। এ প্রক্ষাপটে অবতীর্ণ

প্রথম আয়াতে এদের পথভ্রষ্ট এবং কাফির বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে এরা ইসলামের পথে ফিরে না এলে এবং তাদের সাথে কোন সন্ধিচুক্তি না থাকলে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা এবং গ্রেফতার ও হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে। [রূহুল মা 'আনী]

এদেশের শতকরা ৯০ % মানুষ মুসলমান। কিন্তু আমরা এ লজ্জা লুকাবো কোথায় ? মাওলানা আকরাম খাঁর কাছে সাংবাদিকতার সবক নিয়ে এবং মাওলানা ভাষানীর কাছ থেকে রাজনৈতিক জ্ঞান আহরণ করে এদেশের গুটি কতেক বাম -চিন্তার সাংবাদিক ও রাজনৈতিক শতকরা ৯০ জন মানুষের 'বিবেক' আলিম সমাজের বিরুদ্ধে বিষাক্ত ছোবল হেনে যাচ্ছে। তাদেরকে ফতোয়াবাজ, সাম্প্রদায়িক , স্বাধীনতা বিরোধী , দেশেদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। মানবতার এই গুটিকতেক শত্রু যখন আমাদেরই মাঝে সদম্ভে অবস্থান করে আমাদের ধর্ম , নাগরিক স্বাধীনতা , রাজনীতিক করার অধিকার , বাক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জঘণ্য উক্তি করে,আমাদের অধিকারসমূহ 'নিষিদ্ধ ' করার জন্য চিতকার জুড়ে দেয়ার দুঃসাহস দেখায় , তখন আমাদের এ ব্যররথতার জন্য আমরা কিভাবে রাসূলের (ﷺ) এর উত্তরসূরী হিসেবে পরিচয় দিতে পারি ? রাসূল (ﷺ) এর জীবন ইতিহাস , ইসলামের ইতিহাস কি বলে ? ইসলামের স্বার্থ

রক্ষা, সত্যের বানীকে সমুন্নত রাখার জন্য যত অচলায়নতই বাঁধা হয়ে দাড়াক তাকে ভাংতে হবে, ডিঙ্গিয়ে যেতেই হবে। ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন রাখতে হলে, যা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করে দেয় ‘নিয়মতান্ত্রিকতার’ নামে তার সাথেও আপোষ করার কোন নজীর নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার দুটি পর্যায় রয়েছে। মুখের বা কলমের, অন্যটি তলোয়ারের। দুর্বল হলেই কেবল অন্যায়কে ঘৃণা করে নীরব থাকতে বলা হয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, শহীদের রক্তই কেবল বিজয়ের রাজপথ দেখিয়ে দিতে পারে, আর সবল হয়েও বিকল্প পন্থা বেছে নেয়া কাপুরুষতাও বটে। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের উদাসীনতা বা অহেতুক অসহায়ত্ব প্রদর্শনের জন্য এ দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে যতখানি আঘাত হানা হয়েছে, মুসলমান বলে আমাদের মর্যাদায় যতখানী কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে তা’ মোচন করতে নতুন করে কোন নবী, রাসূল ওহী বা দূত আসবেন না। আমাদের ভাগ্য আমাদেরই পাল্টাতে হবে। আমাদেরই ইসলামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন ভবিষ্যত রচনায় তৎপর হতে হবে। ইতিহাসের অমূল্য শিক্ষা হল, সমাজে সর্বদা ভাল মানুষের সংখ্যা কমই থাকে এবং সেই ভাল মানুষেরা যখন নিস্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে তখন জঘন্য চরিত্রের মানুষেরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের মালিক মোখতার বনে যায়। তখন সাধারণ মানুষের চেয়েও সেই অল্প সংখ্যক

ভাল মানুষের দুর্ভোগের পরিমাণও হয় অনেক বেশী। আমরা কি সেই পরিণতি থেকে খুব একটা দূরে আছি? এভাবে লাশের মত বেঁচে থাকার স্বার্থকতা কি?

** ***

দেশে দেশে ইসলাম

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের

প্রশংসিত অবস্থান এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত
নাসীম আরাফাত
ম্যান্ডেলা। নেলসন ম্যান্ডেলা। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। একটি অগ্নি শিখা। নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতার আশা ও আস্থা। অবহেলিত কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতার প্রতীক। এক আপোষহীন নেতা। ইস্পাত কঠিন তাঁর মনোবল। এখন তিনি দক্ষিন আফ্রিকার নির্বাচিত প্রসিডেন্ট।

ম্যান্ডেলার রাজনৈতিক দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস আজ বিজয় আনন্দে মুখর। কিন্তু ক’জনে জানে, বিশলক্ষ অকুতোভয় মুসলমানও ছিলো এই দলের অগ্রসৈনিক। যারা বুলেটের পিচ্ছিল পথে পায়ে পায়ে এগিয়ে

গেছে স্বাধীনতা লাল গোলাপ ছিনিয়ে আনতে। যারা ছিলো জানবাজ, মরণজয়ী। তা ছাড়া এটাও কি কম আশ্চর্যের কথা যে, বর্তমান সরকারের মন্ত্রীসভার চারজন মন্ত্রীই মুসলমান। তাও আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আইন ও বিচার মন্ত্রী এবং প্রাদেশিক বিষয়ক তদন্ত মন্ত্রী মত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদে রয়েছে পঞ্চাশেরও বেশী মুসলিম সংসদ সদস্য।

আজ দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানরা গর্বিত, পুলকিত। তাদের বিশ্বাস, তারা দুর্দম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এক উজ্জ্বল জ্যোর্তিময় ভবিষ্যতের দিকে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানরা কিছু কিছু অঞ্চলে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। শুনলে আশ্চর্য হবেন, দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিনাঞ্চলীয় প্রশিদ্ধ ঐতিহাসিক শহর কেপটাউনে মালেশিয়ান ও আঞ্চলিক মুসলমানদের মালেশিয়ান ও আঞ্চলিক মুসলমানদের সংখ্যা ৬০% পৌঁছে গেছে। মুসলমানরা আজ রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ামকশক্তি হয়ে দাড়িয়েছে। তাদের সন্তুষ্ট করতে, তাদের দাবী আদায়ের জন্য সবগুলো রাজনৈতিক দলই সদা তৎপর, অত্যন্ত উদগ্রীব এবং আন্তরিক।

আজ থেকে তিনশত বছর পূর্বে দক্ষিন আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চল মুসলমান

মুবাল্লিগরা ঈমানের দাওয়াত নিয়ে আগমন করেন। ইন্ডিয়ান ও মালেশিয়ান মুসলমানরাও তখনই দক্ষিন আফ্রিকায় আগমন করে। তারা স্থানীয় বর্বর অসভ্য প্রায় মানুষদের মাঝে চির সত্য, ন্যায় ও সভ্যতার আলোক মশাল তুলে ধরেন। ফলে স্থানে স্থানে তার অপূর্ব সুহফা দেখা দেয়। মুসলমানদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে আজো দক্ষিন আফ্রিকার মুসলমানরা শিক্ষা- দীক্ষায় সবার শীর্ষে। অত্যন্ত আনন্দের কথা, শিক্ষিত মুসলমানরা বিভিন্নভাবে ঐকবদ্ধ শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন দক্ষিন আফ্রিকায় ১২ সহস্র কিছু বেশী চিকিৎসক আছে। অথচ ইসলামিক মেডিকেল এসোশিয়েশন নামে মুসলিম চিকিৎসকদের স্মিতির সদস্য সংখ্যা বার শত জন প্রায়।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তুলনা করলে এ সত্যটি প্রতিয়মান হয় যে, দক্ষিন আফ্রিকায় মুসলমানরা আজ আর কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। অথচ ইতিপূর্বে বৈষম্যপূর্ণ আইনের কারণে মুসলমানরা ব্যবসা বানিজ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি কখনো। এমনকি শহরের বানিজ্যিক এলাকায় স্থানীয় মুসলমানদের তেমন সুযোগ ছিলো না। ফলে উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে তারা জায়গায় জায়গায় বাঁধা প্রাপ্ত হতো, তারা ব্যাংক ঋণ নিতে পারতো না। স্টক একচেঞ্জেরও সদস্য হতে পারতো না। কিন্তু মুসলিম জাতি কখনো হতাশ

হয় না, তাই আল্লাহ্র অসীম রহমতের ভরসায় মাটি কামড়ে তারা পড়েছিলো। তারা বিহস্বাস করতো যে, স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য আবার উদিত হবেই।

দক্ষিন আফ্রিকার মেঘলা আকাশে আজ উদিত হয়েছে মুক্তি অ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। মুসলমানরা এখন দূর্বার। সর্বত্র তাদের অবাধে পদচারনা। মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাতে এখন প্রচুর সুযোগ। বহু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক আজ মুসলমান। ন্যাশনাল ক্লথ ফাউন্ডেশন দক্ষিন আফ্রিকার এক নাম করা প্রতিষ্ঠান। জনাব ওয়াহেদ সাহেব এর ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি আবার ফরেষ্ট ন্যাশনাল ব্যাংকের ডাইরেক্টরও বটে।

কিছুদিন আগেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা ছিলো দক্ষিন আফ্রিকার মুসলমানদের একটা দুরাশা, দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সেখানে আল বারকা ও ইসলামী ব্যাংক নামে দুটি ব্যাংক ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত এই ব্যাংক দুটি অভাবনীয় সফলতার সাথে দৃপ্ত পদে দূর্বার গতিতে সম্মুখ সফরে এগিয়ে চলেছে। আসুন ব্যাংক দু’টির ডাইরেক্টরদের ভাষ্য শিনি। তারা বলেছেঃ আমরা যুগপৎ ব্যাংক গুলোকে ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী চালাচ্ছি এবং রাষ্ট্রের উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে

অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছি। এদিকে প্রশাসন ও ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। তাই প্রশাসনও চায় সাড়া দেশব্যেপি ইসলামী ব্যাংকের শাখা ছড়িয়ে পড়ুক। এতেই দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি।

কঠোর পরিশ্রমী ও নিরলস দক্ষিন আফ্রিকার মুসলমানরা শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই। ইসলামী ব্যাংকগুলোর সহায়তায় গড়ে তুলছে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রেও তারা শীর্ষ স্থানটি প্রায় ছুই ছুই করছে। চারন ভূমি গুলোতেও মুসলমান রাখালদের প্রাধান্য লক্ষ করার মত।

আটলান্টিক মহা সাগরের সৈকতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শহর কেপটাউন। এ শরেই বিগত ২রা এপ্র মুসলিম আগমনের তিনশত বৎসর পূর্তি উৎসব পালন হলো মহা সমারোহে। সাদা ধব ধবে পোষাকে এক লাখ মুসলমানের এই বিরাট সমাবেশ ছিলো এক দর্শনীয় এবং আনন্দ দায়ক সমাবেশ। আনন্দের আতিযগ্যে কেউ কেউ একে হজ্জ্বের মহা সমাগমের সাথে তুলনা করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। শহরের ব্যস্ততম পথগুলো অতিক্রম কালে তাদের মুখে ছিলো তাকবীরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আর তাসবীহের সুমধুর গুঞ্জন। এই অভিনব দৃশ্য, এই মনোমুগ্ধকর অভূতপুর্ব সমাবেশ, এই সুন্দর শৃঙ্খলা

দক্ষিনাফ্রিকার সর্বত্র সৃষ্টি করেছে এক মধুময় আবহ।

আরো সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে যখন যোহরের নামাজের সময় মুসলমানরা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দলে দলে নামযে দাড়িয়ে নামায আদায়ে নিমগ্ন হয়েছে। দক্ষিন আফ্রিকার কোন ধর্ম এতো সুন্দর উপমার অবতারণা করতে পারে নি। পারে নি মুসলমানদের মত এতো ঐক্য, এতো ভ্রাতৃত্ব এতো শৃঙ্খলার পরিয়চ দেখাতে।

সেদিনই সন্ধায় গডহোপ সেন্ট্রাল ময়দানে এলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। জাভার মুসলিম মুবাল্লিগ শাইখ ইউসূফের প্রশংসাবাদ ও গুণকীর্তন করা ও মুসলমানদের সাথে আন্তরিক সাক্ষাৎকার মিলিত হওয়া জন্য। তাই বহু মুসলীম এসে সমবেত হলো গডহোপ সেন্ট্রাল ময়দানে। ম্যান্ডেলার ভাষন শুনবে। তাকে একনজর দেখবে। মুসলিম নবজাগরনে তার প্রতিক্রিয়া শুনবে।

ম্যান্ডেলা সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। শাইখ ইউসূফের প্রচুর প্রশংসা করলেন। বললেন, আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি অকপটে, এ চির সত্যকে গোপন করতে পারবে না যে, শাইখ ইউসূফই হলেন আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও নির্যাতন চির অবসানের মূল শক্তি। শাইখ ইউসূফসহ অন্যান্য মুসলিম নেতারা আমাকে আমার কারাবরণ কালে ও দেশান্তরিত হওয়ার সময় আমাকে সর্বাত্তক

সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমার মনে সাহস জুগিয়েছেন। সম্মুখ যাত্রাকে আরো নিশ্চিত , দৃঢ় ও শক্তিশালী করেছেন। সাইখ তুযান সাঈদের নাম নিয়ে বলেন , আজ এই আনন্দ ঘন মূহুর্তে তিনি নেই। তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু তার আন্তরিকতার কথা আজো ভুলতে পারছি না। তারপর ম্যান্ডেলা সমেবেত বিশাল জনতার সম্মুখে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন যে , দক্ষিন আফ্রিকায় মুসলমানদের জীবন ধারা তাদের ধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী পরিচালনার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিয়ে -শাদী , তালাক, মিরাছ ইত্যকার বিষয় তাদের উপর অন্যজাতির আইন বা প্রথা চাপিয়ে দেয়া হবে না।

বক্তৃতা চলাকালে ম্যান্ডেলা অকপটে বলেন, মুসলমানদের নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ন্যায় ও ইসসাফের ভিত্তিতে এক পবিত্র সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আগমন করেছিলেন। তখন জনতার মূহুর্মূহু তাকবীর ধ্বনি - প্রতিধ্বনিতে চার দিক মুখরিত হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক এই মহা সমাবেশে উপস্থিত মেহমানদের মধ্য থেকে মালেশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দাতুক ছারী নজীব ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদলের প্রধান ডক্টর আহমদ নূরানীও বক্তৃতা দেন।

দক্ষিন আফ্রিকায় ক্ষমতার রদবদলের সাথে সাথে মুসলমানদের উন্নতি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

সংখ্যালঘু শেতাঙ্গদের নির্যাতন নিপীড়ন ও অত্যাচারে উন্মুখ পেশী -শক্তি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মানুষের মাঝে ফিরে এসেছে শান্তির ফুরফুরে বায়ুপ্রবাহ। এদিকে ম্যান্ডেলাও জনগণের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর। তিনি ঘোষণা করেছেন, দক্ষিন আফ্রিকায় সকল ধর্মের লোকদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন।

দক্ষিন আফ্রিকার মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতি ও তাদের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পেছনে যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় তাহলো তাদের মুসলিম জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যবদ্ধতা। তাই আজকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিপীড়িত মুসলমানদের মাঝে যদি মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় এবং অবশ্যই গোটা মুসলিম বিশ্ব তাদের হৃত মর্যাদা ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারবে।

****

আমরা যাদের উত্তরসূরী

হযরত বারায়া বিন মালেক আল - আনছারী (রাঃ)

ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা

হযরত রাসূলে করীম () এর কনিষ্ঠ খাদিম, জলিলুল কদর সাহাবী হযরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ) এর ছোট ভাই ছিলেন বারা’য়া বিন মালেক আল আনছারী। তিনি অত্যন্ত হালকা-পাতলা গড়নের ছিম-ছাম দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। মাথায় ছিল কোঁকড়ানো চুল। এই যুবক সাহাবী ছিলেন এতই হালকা পাতলা, দেখলে মনে হত খুবই দুর্বল। অথচ তার বুদ্ধিমত্তা, অদম্য সাহসিকতা, প্রবল ঈমানী চেতনা ও অসাধারণ সমর কৌশল রীতিমত ইতিহাস হয়ে আছে।

এই ক্ষীণ দেহের অধিকার বারা’য়া বিন মালেক আল আনছারী শুধু মল্লযুদ্ধেই শতাধিক মুশরিক যোদ্ধাকে পরভূত করে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। মল্ল যুদ্ধ ছাড়াও সম্মুখ সমরে যে কত কাফির ও মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে ইসলামের বিজয়কে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তার ইয়াত্তা নেই। যুদ্ধের দামামা তার রক্তে এমন ক্ষীপ্রতা অ তেজস্বীতার সৃষ্টি করতো যে নিজ দল-বল পিছনে রেখে একাই শত্রুপক্ষে প্রাচীর ভেদ করে দু’মুখো তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার এই ব্যাকুল অগ্রগামীতা লক্ষ্য করে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তার প্রতি এক বিশেষ বিধি নিষেধ আরোপ করে। তিনি সমগ্র মুসলিম

বিশ্বের সেনাপতিদের কাছে এই বলে ফরমান জারি করেনঃ

“বারা’য়া বিন মালিক আল আনসারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে কোন ইউনিটের দায়িত্ব যেন না দেয়া হয়। কারণ আমি আশংকা করছি যে, শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বারা’য়া বিন্ মালেক আল আনসারীর যুদ্ধ করার যে মানসিকতা রয়েছে, যার ফলে তার অধীনস্ত সমগ্র বাহিনীই শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবে”।

বারা’য়া বিন্ মালেক আল্ আনসারী (রাঃ) এর ইতিহাস সৃষ্টিকারী অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি মাত্র ঘটনা সম্মানিত পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

হযরত বারা’য়া বিন্ মালেক আল আনসারী (রাঃ) এর সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর। যখন নবদীক্ষিত মুসলমানেরা দলে দলে ভন্ড নবীদের দলে শামিল হচ্ছিল। ইসলামের এই চরম দুরযোগ মুহূর্তে আল্লাহ যাদের দৃঢ় মনোবল এবং ঈমানী মজবুতী দান করেছিলেন, শুধু তারা ব্যতীত অন্য সকলেই মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তায়েফ, মক্কা ও মদীনাসহ বিক্ষিপ্ত কিছু গোত্র ছাড়া বাকী সর্বত্রই এই ফেতনা ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

এই দুরযোগ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের হিফাজতের জন্য আমিরূল মুমিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে চতুর্মুখী ফেতনা মোকাবেলার যোগ্যতা ও দৃঢ়তা দান করেন। তিনি পাহাড়সম অটল হয়ে একাধারে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের এবং ভন্ড নবী ও তাদের অনুসারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। আনসার এবং মুহাজিরদের সমন্বয়ে তিনি সশস্ত্র দশটি বিশেষ বাহিনী তৈরী করে প্রত্যেক বাহিনীর জন্য আলাদা আলাদা ঝান্ডা নির্ধরণ করলেন। ভন্ডনবীদের সমূচিৎ শিক্ষা দিয়ে বিপদগামী ও ধর্মত্যাগী মুরতাদদের ইসলামে প্রত্যাবর্তনের জন্য এসব বাহিনীকে আরব বিশ্বের চতুর্দিকে প্রেরণ করেন।

ভন্ডনবী ও তাদের অনুসারী মুরতাদদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল বনু হানিফা সম্প্রদায়ের মুসায়লামাতুল কাযযাবের। মুসায়লামাতুল কাযযাব তার নিজস্ব গোত্র এবং সন্ধিতে আবদ্ধ সম্প্রদায় সমূহের সুদক্ষ চল্লিশ হাজার যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেছিল। এই বাহিনী ইসলামের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ ছিল। যাদের অধিকাংশই ছিল সংকীর্ণ ভৌগলিক ও বংশীয় জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী। যারা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের পরিবর্তে গোত্রীয় গোড়ামী, সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিকতার

শিকারে পরিণত হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকের ভাষ্য এই ছিলঃ

"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে মুসায়লামাতুল কাযযাব একজন ভন্ডনবী এবং হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) সত্যবাদী নবী। কিন্তু আমাদের কছে সত্যবাদী নবীর চেয়ে স্বগোত্রীয় ভন্ডনবী ও মিথ্যাবাদী মুসায়লামাতুল কাযযাব ভাল"।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসায়লামাতুল কাযযাবের মোকাবেলা করার জন্য আবু জেহেলের ছেলে একরামার নেতৃত্বে যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড হামলার মুখে পরাজিত হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে আনসার এবং মুহাজির সাহাবাদের মধ্যে বিশিষ্ট যোদ্ধাদের সমন্বয় গঠিত যে বাহিনী প্রেরণ করেন তাদের মধ্যে হযরত বারা'য়া বিন মালেক আল আনছারীও ছিলেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ভন্ডনবী মুসায়লামাতুল কাযযাব এবং তার অনুসারীদের সমুচিৎ শিক্ষা দিয়ে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য সাহাবী যোদ্ধাদের এই বিশেষ বাহিনী নিয়ে দ্রুতগতিতে নজদের 'ইয়ামামা' নামক প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুহূর্তের মধ্যেই উভয় পক্ষের মধ্যে এক প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো।

যুদ্ধ শুরুর প্রায় সাথে সাথেই মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিশাল সশস্ত্র বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে কাবু করে ফেলে। অবস্থা এই দাড়ায় যে, সু-শৃংখল মুসলিম বাহিনীর পায়ের নীচের মাটি যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল। নিজেদের অবস্থান থেকে ক্রমেই তারা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল। এ নাজুক মুহুর্তে মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের তাবুতে হামলা করে তাবুর খুঁটি উপড়ে ফেলে। এমনকি সেখানে অবস্থানরত খালিদ বিন ওয়ালিদের স্ত্রীকে হত্যার জন্য উদ্যত হলে মুসায়লামাতুল কাযযাব বাহিনীরই একজন যোদ্ধা জাহেলিয়াতের প্রথানুযায়ী “যুদ্ধ ক্ষেত্রে শিশু ও নারীদের হত্যা কয়া কাপরুষোচিত ও গর্হিত কাজ” –একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা’কে রক্ষা করেন।

এ চরম বিশৃংখল অবস্থায় মুসলিম যোদ্ধারা নিশ্চিত পরাজয়ের আশংকায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। তারা একথা মনে করছিলেন যে, মুসায়লামাতুল কাযযাবের কাছে আজ পরাজয়ের পর এই আরব বিশ্বে ইসলামের নাম উচ্চারণ করার মত আর কোন ব্যাক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। শিরক মুক্ত এই জাজীরাতুল আরবে তৌহীদের বাণী উচ্চারণ ও আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য কেউ সাহস করবে না।

সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নিজ তাবু আক্রান্ত হওয়ার পর এই চরম নাজুক মুহূর্তে খালিদ বিন ওয়ালিদ বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাথে সাথে তিনি মুহাজির, আনসার, শহরবাসী ও মরুবাসী বন্ধু যোদ্ধাদের ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক কোম্পানীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঝান্ডা নির্ধারন করেন। যেন প্রত্যেক বাহিনী স্বীয় অস্তিত্বের স্বার্থেই শত্রু বাহিনির মকাবেলায় মরণপণ চেষ্টা চালায় এবং কোন গ্রুপের পক্ষ থেকে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাও চিহ্নিত করা সহজ হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয় বাহিনীর মাঝে পুনরায় যুদ্ধ বেঁধে গেল। ভয়াবহ সে যুদ্ধ! মুসলিম যোদ্ধারা এর পূর্বে এমন মারাত্মক কোন সংঘর্ষ কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। এবার বীর বিক্রমে মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর উপ্র ঝাপিয়ে পড়ল। তারা মুসালামাতুল কাযযাব বাহিনীর যোদ্ধাদের ধরাশায়ী করে ইয়ামামার ময়দান লাশের স্তুপ পরিণত করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অপর পক্ষে, মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনী তাদের এই মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেও যুদ্ধ ময়দানে তখনও পাহাড়ের মত অটল হয়ে মুসলমানদের মোকাবেলা অব্যাহত রাখল। মুসলিম যোদ্ধারা ঈমানী চেতনায় বলীয়ান হয়ে

যুদ্ধের ক্ষিপ্রতাকে আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছিল।

হযরত ছাবেত বিন কায়েস (রাঃ) মুসলিম যোদ্ধাদের আনছার বাহিনীর ঝান্ডাবরদার ছিলেন। তিনি যুদ্ধের এই তীব্রতাকে লক্ষ্য করে তার পরিচালিত বাহিনীর এই ঝান্ডাকে পিছনে সরিয়ে নিতে হতে পারে, তা আঁচ করে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ময়দানে তার দু’পায়ের হাটু পর্যন্ত মাটির নীচে গেড়ে ফেললেন। মুহূর্তেই শত্রু সৈন্যরা তার দু’পায়ের হাটু পর্যন্ত মাটির নীচে গেড়ে ফেললেন। মুহূর্তেই শত্রু সৈন্যরা তার বহনকৃত ঝান্ডাকে ভুলুন্ঠিত করার জন্য তার ওপর আঘাত হানতে শুরু করল। তিনি একহাতে ঝান্ডাকে সমুন্নত রেখে অন্য হাতে তরবারী পরিচালনা করে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে এক পর্যায়ে দুশমনের তরবারীর আঘাতে দ্বি’খন্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

যুদ্ধের এই তীব্রতা অ প্রচন্দতার মাঝে মুহাজির বাহিনীর মধ্য হতে আমিরুল মু’মিনীন হযরত উমর (রাঃ) এর ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব দুশমনের উপর আরও তীব্র গতিতে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য মোহাজিরদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছিলেনঃ

“হে যোদ্ধারা! আরও ক্ষীপ্র গতিতে আঘাত হান, সম্মুখ পানে অগ্রসর হও, শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়। হে যোদ্ধারা! জেনে রাখ, এটাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ আহবান। হয় আজ

মুসায়লামাতুল কাযযাবকে নিশ্চিহ্ন করবো অথবা শহীদ হয়ে আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে যাব”।

এ আহবানের সাথে সাথেই সমস্ত মুসলিম মুজাহিদ নব চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে শত্রু বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করল। হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ) দু’হাতে তরবারী চালাতে চালাতে ক্ষীপ্র গতিতে দুশমনদের মাঝে ঢুকে পরলেন। অসংখ্য মুরতাদদের ধরাশায়ী করার এক পর্যায়ে শত্রুর আঘাতে তিনি শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়ে তার কৃত ওয়াদাকে বাস্তবে প্রমাণিত করেন।

আবু হুযায়ফার কৃতদাস হযরত ছালেম (রাঃ) এর উপর মুহাজির বাহিনীর ঝান্ডা বহন করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। মুহাজিরগণের অনেকেই তার প্রতি আশংকা পোষণ করেছিল যে, যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে তিনি সন্ত্রস্তবোধ করবেন। তারা তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আমরা আশংকা করছি যে, তুমি যুদ্ধের প্রচন্ডতায় ভীত হয়ে পশ্চাদপসরণ না করে বস’। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, “আমি যদি এ যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি তাহলে আমার চেয়ে নিকৃষ্টতম হাফেজ কুরআন আর কে হতে পারে? অতঃপর তিনি বীর বিক্রমে দুশমনদের প্রতি আঘাত হানতে হানতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুরতাদদের তরবারীর আঘাতের পর আঘাতে তার গোটা শরীর ক্ষত-

বিক্ষত হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্বেও তিনি ইসলামের ঝান্ডাকে এক মুহুর্তের জন্য ভূলুন্ঠিত হতে দেননি।

কিন্তু এ যুদ্ধে বারা’য়া বিন মালেক আল আনছারীর বীরত্বের কাছে এসব ঘটনা একেবারে নগন্য বলে মনে হবে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ উভয় পক্ষের প্রাণপন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এই প্রচণ্ডতার মধ্যে চুড়ান্ত আঘাতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আল আনছারী (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, “দুশমনদের উপর ঝাপিয়ে পড় হে আনসার যুবক….” । হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের এই নির্দেশ পেয়ে হযরত বারা’য়া (রাঃ) তাঁর বাহিনীর যোদ্ধাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেনঃ

“হে আনছার ভাইয়েরা! কখনো আপনারা মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা করবেন না। এ মুহূর্ত হতেই আপনাদের জন্য আর মদীনা নয়। তাওহীদের বাণীকে চিরসমুন্নত করে জান্নাতের পানে অগ্রসর হোন”।

এই বলে তিনি তার বাহিনী নিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। হযরত বারা’য়া বিন মালেক (রাঃ) দক্ষতার সাথে দু’ধারী তরবারী চালিয়ে তার দু’পার্শ্বের দুশমনদের ধরাশায়ী করে সম্মুখ অগ্রসর হতে লাগলেন। মুসায়লামাতুল কাযযাব এর যোদ্ধাদের শিরচ্ছে করতে করতে তিনি এক মহা কান্ড সৃষ্টি করলেন। এ আঘাতে মুসায়লামাতুল কাযযাব ও তার বাহিনীর মধ্যে হঠাৎ ভীতি ও

ত্রাসের সৃষ্টি হলো। অবস্থা বে-গতিক দেখে তারা যুদ্ধ ময়দান সংলগ্ন বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। যে বাগানটি পরবর্তী সময়ে অগণিত মৃত্যু দেহের স্তুপের কারণে “হাদিকাতুল মাউত” বা “মৃত্যুর বাগান” নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানাবিধ ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাগানটি উচু ও প্রশস্ত দূর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত ছিল। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে প্রাণ রক্ষার জন্য মুসায়লামাতুল কাযযাব ও তার অনুসারী যোদ্ধারা বাগানে আশ্রয় নিয়ে দ্রুত এর একমাত্র গেটটি বন্ধ করে দেয়। অতঃপর নিজেরা নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে তার ভিতর থেকে মুসলমান বাহিনীর উপর বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ শুরু করে। এতে মুসলমানদের নিশ্চিত বিজয় আবার অনিশ্চিয়তার দ্বার প্রান্তে যেন উপনীত হয়। মুসলিম যোদ্ধাদের পক্ষে তাদের মোকাবেলা করার সমস্ত পথ যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর অন্যতম বির যোদ্ধা হযরত বারা’য়া বিন মালেক আল আনসারী (রাঃ) যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতি এক চরম অ শেষ আঘাত হানার জন্য পরিকল্পনা নেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি ঢাল সংগ্রহ করে তার বাহিনীর লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, “আমি এ ঢালের উপরে বসে পড়ি, তোমরা ১০/১২টি বর্ষা ফলকের

সাহায্যে উপরে তুলে আমাকে এ গেটের ভিতরে নিক্ষেপ কর। হয় আমি দুশমনদের হাতে শহীদ হয়ে যাব অথবা ভিতরে গিয়ে তোমাদের জন্য এ সুরক্ষিত বাগানের গেট খুলে দিব”।

দেখতে না দেখতেই হযরত বারা’য়া বিন মালেক আল আনছারী (রাঃ) উন্মুক্ত তরবারী হাতে বৃহদাকার ঢালটির উপর বসে পড়লেন। অত্যন্ত হালকা-পাতলা ও ছিপ ছিপে আনছার যুবক হযরত বারা’য়াকে কয়েক জনে খুব সহজেই ঢালে বসিয়ে মাথার উপরে তুলে নিলেন এবং সাথে সাথে অন্য কয়েকজন বর্ষাধারী তাদের বর্ষা ফলকে তাকে উপরে তুলে গেটের ভিতরে মুসায়লামাতুল কাযযাবের হাজার হাজার অনুগত যোদ্ধার মাঝে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। হযরত বারা’য়া অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের মাঝে বজ্রপাতের ন্যায় লাফিয়ে পড়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে গেট রক্ষী বাহিনীর উপুর অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে গেট রক্ষী বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করলেন। অন্যদিকে মুসায়লামাতুল কাযযাবের দূর্ধর্ষ সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ভিমরুলের মত তাঁর গোটা দেহকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললো। কিন্তু হযরত বারা’য়া বিন মালেক আল আনছারী (রাঃ) সিংহের মত বর্ষার আঘাতে হুংকার ছেড়ে তাদের বেষ্টনী ভেদ করে পরিশেষে গেট খুলে দিতে সমর্থ হলেন। এদিকে সাথে সাথে অপেক্ষমান বীর মুসলিম যোদ্ধারা আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে

বাঁধ ভাংগা স্রোতের মত ভিতরে ঢুকতে শুরু করলেন। সে ছিল এক নজীর বিহীন ভয়াল চিত্র। মুহূর্তেই উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনী প্রাণ ভয়ে দিক বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো আর মুসলিম যোদ্ধারা এ সুযোগে তাদের দলে দলে নিঃশেষ করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সেখানে মুসায়লামাতুল কাযযাবের অবশিষ্ট বিশ হাজার সৈন্যের কবর রচনা করে ফেলে তাদেরকে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষেপ করা হলো। সমস্ত বাগান বিশ হাজার মুরতাদের লাশের স্তুপে পরিণত হয়ে গেল।

অন্যদিকে এই দুঃসাহী বীর যোদ্ধা হযরত বারা’য়া বিন মালেক আল আনছারী (রাঃ) যিনি এ গেট খুলতে গিয়ে তাঁর শরীরে আশিটির অধিক তীর, বর্ষা ও তরবারীর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন, তাঁকে বিশেষ চিকিৎসার কন্য চিকিৎসা তাবিতে প্রেরণ করা হলো। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) দীর্ঘ এক মাস ধরে নিজে হযরত বারা’য়া (রাঃ) এর খিদমতে নিয়োজিত থাকলেন। ধীরে ধীরে হযরত বারা’য়া (রাঃ) সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর এই মহান ত্যাগ এবং কোরবানীর বদৌলতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তারই হাতে মুসলমানের এ যুদ্ধে বিজয় দান করে জাজিরাতুল আরবকে

চিরদিনের জন্য ভন্ডনবী ও মুরতাদদের হাত থেকে পবিত্র করলেন।

মুসায়লামাতুল কাযযাব বাহিনীর সাথে ইয়ামামার প্রান্তরে ‘হাদিকাতুল মাউতের’ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শাহাদাতের মৃত্যুর গৌরব থেকে মাহ্রুম হয়ে হযরত বারা’য়া বিন মালেক আল আনছারী (রাঃ) শাহাদাতের তামান্নায় পরবর্তীতে একের পর এক সব যুদ্ধে বীরত্ব সাথে অংশগ্রহণ করেন। তার জীবনের সর্বোচ্চ আকাংখা তিনি যেন শাহাদাতের মৃত্যুর মাধ্যমে হযরত রাসূল কারীম (ﷺ)এর সাথে জান্নাতে মিলিত হতে পারেন।

সর্বশেষে তিনি পারস্য সম্রাটের সাথে মুসলমানদের ‘তুসতর’ কেল্লা বিজয়ের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক পর্যায়ে সৈন্যরা দূর্ভেদ্য ‘তুসতর’ কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে এর দরজামুখ বন্ধ করে দেয়। মুসলিম যোদ্ধারা এই কেল্লার চর্তুপার্শ্বে অবস্থান নিয়ে কেল্লাটিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। ধীরে ধীরে সব রসদ ও সরঞ্জামাদি নিঃশেষ হয়ে আসলে পারস্য বাহিনী জীবন রক্ষার লড়াইয়ে এক ধ্বংসাত্মক কৌশল অবলম্বন করে। তারা লম্বা শিকলের মাথায় মাছ ধরা বড়সির মত লৌহ নির্মিত বড় বড় আংটা গুচ্ছ আগুনে পুড়িয়ে লাল করে কেল্লার উপ থেকে মুসলমানদের উপরে নিক্ষেপ করে তাতে আটকিয়ে যাওয়া যোদ্ধাদের ক্রেনের মত

তুলে নিতে শুরু করে। এভাবে বেশ ক’জন মুসলিম যোদ্ধা এর নির্মম শিকারে পরিণত হয়। অকস্মাৎ একটি আংটা গুচ্ছ হযরত বারা’য়া বিন মালেকের বড় ভাই বেষ্টিত হয়ে তাকে তুলে নিতে শুরু করে। হযরত বারা’য়া বিন মালেক আল আনসারী কাল বিলম্ব না করে এক লাফে শিকলটিকে ধরে ফেলে এক হাতে ঝুলন্ত অবস্থায় অন্য হাতে আনাছ (রাঃ) এর শরীরে বিদ্ধ গরম আংটাকে খুলতে শুরু করেন। লাল টকটকে পোড়া আংটার দাহে তাঁর হাতের গোশত পুড়ে ধোয়া বের হতে লাগলো। কিন্তু তিনি তাঁর জলন্ত হাতের অসহ্য কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে হযরত আনাছ (রাঃ) কে আংটার হাত থেকে ছাড়ানো মাত্রই এক লাফে নীচে নেমে আসেন। তখন তাঁর পোড়া হাতে শুধু হাড়গুলো ছাড়া আর কোন গোশ্ত অবশিষ্ট ছিলনা।

এই ‘তুসতর’ কেল্লা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি আল্লাহ্র দরবারে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই দোয়া কবুল করে নেন। এই যুদ্ধেরই এক পর্যায়ে তিনি শত্রুর তরবারীর আঘাতে শাহাদাতের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বহু আকাংখিত শাহাদাতের মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যের পথ রচনা করে পরবর্তী উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জান্নাতে হযরত বারা ’য়া বিন মালেক আল আনছারীর মুখমন্ডল উজ্জ্বল করুন ও মুহাম্মদ (ﷺ) এর উম্মতদের দর্শনে তাঁর চক্ষুদ্বয় শীতল আনন্দিত করুন এবং আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সহায় হোন।

ভাষান্তরঃ অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী

****

ইতিহাসের পাতা থেকে

প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপা দেয়া ইতিহাস

কালাম আহমদ মোর্তাজা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাওলানা শরিয়তুল্লাহঃ - পূর্ব বঙ্গে মাদারীপুর গ্রামে শরিয়তুল্লার জন্ম হয়। তাঁর বাবা মা যে খুব ইসলাম দরদী ছিলেন , তাঁর নামই তার সাক্ষি। আঞ্চলিক পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে মাও লানা বাশারত আলীর কাছে যুবক শরিয়তুল্লাহ উচ্চ শিক্ষা নিতে থাকেন। ঐ মাও লানা সাহেব ছিলেন হজরত সৈয়দ

আহমদ বেরেলী সাহেবের ভক্ত এবং একজন গুপ্ত যোদ্ধা। সুতরাং জিহাদের মন্ত্র দিতে ও নিতে কারও কোন বাঁধা ছিল না। তারপর গুরু- শিষ্য মক্কা গেলেন। সেখানে আরও উচ্চ শিক্ষা ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত পন্ডিত তাহের সোম্বালের নিকট সুফিতত্তের শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে মিশরের আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে বঙ্গদেশে মাও লানা শরিয়তুল্লাহ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এসে উপস্থিত হন। ওদিকে হজরত আহমদ বেরেলী বঙ্গদশের জন্য এই রকম রত্নেরই তখন খোঁজ করছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় দুজনের যোগাযোগ হয় এবং তাকে কাজ সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। মাও লানা শরিয়তুল্লাহ সাহেব ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেনীর বিরুদ্ধে লড়াই ও ইংরেজের সঙ্গে লড়াই মনে করে শোষিত, অত্যাচারিত কৃষক, তাঁতী, তিলি প্রভৃত অনুন্নত ও দরিদ্র শ্রেনীর মধ্যে আন্দোলন পরিচালনা করেন। এটা খুব মনে রাখা দরকার যে, তখন মুসলমান জমিদারও কিছু ছিলেন, যারা অনেকেই আন্দোলনের প্রতিকুলে ছিলেন।

ঐ সময় হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান কৃষকদের নিকট কালীপুজা, দুর্গাপুজা ইত্যাদিতে কর আদায় করতেন; যা ইসলাম বিরোধী। শুধু তাই নয়, মুসলমান প্রজাদের জন্য ঈদুল-আজহার পর্বে গরু ব্যবহারও বন্ধ

করা হয়েছিল। মাও লানা শরিয়তুল্লাহ পুজায় চাঁদা দিতে মুসলমানদের নিষধ করে এবং গরু ব্যবহার উৎসাহ প্রদান করেন। মোট কথা তিনি ধর্ম সংস্কারকরূপে সংগ্রাম চালিয়ে সংগ্রামের বুনিয়াদ মজবুত করে ফেলেন। সেই সঙ্গে তার ছেলে আলাউদ্দিন আহমাদকে মক্কা পাঠালেন। সেখানে শিক্ষা লাভের পর আলাউদ্দিন বাড়ী ফিরে এলেন এবং পিতার নিকট উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তিনি উপযুক্ত প্রতিনিধিতে পরিণত হলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাওলানা শরিয়তুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

মাও লানা আলাউদ্দিনঃ- পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই মাওলানা আলাউদ্দিন (অশুদ্ধ ও গেঁয়ো নাম দুদু মিঞা) স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি সংগ্রামের ধারা একটু বদল করলেন। হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র শ্রেনীর মানুষের কানে প্রথমে তিনিই সাম্যবাদ প্রাচীর করেন। আরও বলেন, জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি হিন্দুর উপরও অত্যাচার হয় তাহলেও ইসলাম অনুযায়ী আমাদের তাদের পাশে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাওয়া ধর্মের বিধান। যদি না যাওয়া হয় তাহলে তা ধর্মের কাজ হবে। তিনি শাসন্তন্ত্র কায়েম করলেন। তাঁর বাহিনী তলোয়ার, সড়কি, তীর, ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়। সর্বপ্রথম

তিনি বিপ্লবী খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন পুরোপুরিভাবে। এই পদে সর্বোচ্চ স্থানে যিনি থাকতেন তাঁকে বলা হত ‘ওস্তাদজী’। তাঁদের পরামর্শদাতারা দু’জন ছিলেন ‘খলিফা’। এমনি ভাবে সুপারিনটেনডেন্ট খলিফা, ওয়ার্ড খলিফা, গাঁও খলিফা প্রভৃতি নানা নামে একটি গ্রাম ইউনিট ছিল। সুপাঃখলিফা একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা থাকতো, তাঁদের দ্বারা নীচ হতে উপর মহলে যোগাযোগ ও নির্দেশ পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল [দ্রঃ M. A. khan: History of the Faraidi Movement in Bengal, p. 104-112] ।

তাঁরা আদালত বা পঞ্চায়েত গঠন করেন এবং সমস্ত অঞ্চলের বিচার বিপ্লবীরাই করতে থাকেন। মুসলমানদের জাকাত, ওশর ইত্যাদি দাতব্য অর্থ সংগ্রহ করা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, মাদ্রাসা মক্তব তৈরী করা, মসজিদ তৈরী করা প্রভৃতি কাজ যাদু খেলার মত চলতে লাগলো। ওদিকে বিপ্লবীদের সুবিচার তখন ইংরেজ-বিরোধিতার নামান্তর। তাঁরা বলেন, পৃথিবীতে জমি জায়গা যা আছে সব ঈশ্বরের। সেখানে জমিদার বা সরকারের কর নেওয়া জুলুম বা অত্যাচার। মানুষ সব সমান, আমাদের কারো উপর তাদের কর্তৃত্ব করবার অধিকার নেই।

এই সুবাদে অমুসলমানরাও অনেকে তাঁদের কাছে কেস করতেন। বিচারও সুক্ষ ভাবে হত। বিচারের রায় না মানলে তা মানিয়ে নেবার

ক্ষমতা আলাউদ্দিনের সৈন্য বিভাগের ছিল। শেষে অবস্থা অনুকুলে ছিল দেখে তিনি তাঁর এলাকায় ঘোষনা করলেন; যদি কেউ ইংরেজদের আদালতে বিচার প্রার্থী হয় তাহলে তাকে শাস্তি নিতে হবে। এতে ইংরেজ ব্যবসায়ী বা নীলকরের সাহেবরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, আর জমিদার শ্রেনীও খুব অসন্তুষ্ট হল। কিছু মুসলমানের সহযোগিতায় তাঁরা বলতে লাগলো, ‘গরীব ছোটলোকদের’ এত মাথায় তোলা অবিচার মাত্র। অবশেষে ইংরেজের স্তম্ভ জমিদার শ্রেনী, হিন্দু বং মুসলমান উভয় শ্রেনীর বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ শুরু করে এবং তা বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে [দ্রঃ Proceeding of the judicial Department, O.C,No. 25, 29 May 1843p. 462]।

ইংরেজের ইঙ্গিতে ফরিদপুরের সিকদার ও ঘোষ পরিবার নামে দু’জন বড় জমিদারও মুসলমান প্রজাদের জন্য ঘোষনা করলেন, মুসলমানরা গরু কোরবানী করতে পারবে না, কালী ও দুর্গাপুজায় কর দিতে বাধ্য থাকবে। দাড়ির উপরও কর বসানো হয়, আর নিষেধ করা হয়, কোন মুসলমান বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযোগ না রাখতে। প্রথমে কিছু মুসলমান প্রজা তার অবহেলা করলে জমিদাররা তাদের কঠোর শাস্তি দেন। [দ্রঃ A.R. Mallic, 72-73; M.A,Khan, p.27-28]।

আলাউদ্দিন সাহেব ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কানাইপুরের সিকদার ও ফরিদপুরের জয়নারায়ন

জমিদারদ্বয়ের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ আক্রমণ করে উভয়কে পরাজিত করেন। খুব মনে রাখা দরকার যে, ঐ লড়াই হিন্দু-মুসলমানের নয় বরং কৃষক-জমিদারের লড়াই, অথবা ইংরেজ শাসকের শোষনের বিরুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবীদের সংগ্রাম। এরপর কানাইপুরের জমিদার আলাউদ্দিনের দাবি মেনে নেন এবং নিজে ভুলের জন্য ক্ষমা চান। কিন্তু ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ন বাবু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রবল ভাবে বিপ্লবীদের বাধা দেন; ফলে যুদ্ধ তুমুল রূপ নেয়। শেষে বিপ্লবীরা জমিদারের ভাই মদন বাবুকে ধরে নিয়ে চলে যায়। অনেকে বলেন, তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় এবং পদ্মা নদীতে নিক্ষেপ করা হয় [দ্রঃ M.A. Khan, p.27-29]। ঐ হামলায় ৮০০ জন মুসলমান বিপ্লবী যুক্ত ছিলেন। জমিদাররা ইংরেজের আদালতে মামলা করলে বিচারে ২২ জনের ৭ বছর করে জেল হয়। আলাউদ্দিনের অবশ্য কোন শাস্তি হয়নি; তিনি মুক্তি পান। অনেকের মতে এও ঠিক যে, তাঁর শাস্তি হলে হিতে বিপরীত হত। কেননা পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী ঐসময় আলাউদ্দিনের হাতে আশি হাজার লোক প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। [দ্রঃP. J.D.O.C No. 99,7.4. 1847, p. 146]।

১৮৪১ ও ৪২ এর ঘটনার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে জমিদারগণ লড়াই করতে সাহসী হননি। তবে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত

সংবাদ সরবরাহ করা এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জমিদারের সঙ্গে শোষিত মানুষের বা কৃষকের লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়ীক লড়াই বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। অমলেন্দু তাঁর উল্লেখিত পুস্তকের ৭৪ পৃষ্টায় লিখেছেন জমিদারগণ অনেকাংশে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিলেন। লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বলে সাধারণ মানুষকে বোঝানো সম্ভব হয়েছিল।

ঐ সময়ে ডানলপ সাহেব ছিলেন কাসিমপুরের নীলকুঠির প্রভাবশালী সাহেব। ঐ ইংরেজের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ছিলেন কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলাল নামক এক গোমস্তা। ডানলপ সাহেব এবং ঐ ব্রাহ্মন গোমস্তা আট শত সশস্ত্র লোক নিয়ে বাহাদুরের দুদু মিঞার বাড়ী আক্রমণ করেন। বাড়ীর চার জন প্রহরিকে হত্যা এবং বহু ব্যাক্তিকে আহত করে সেই বাজারের দেড় লক্ষ টাকার অর্থ ও সম্পদ নিয়ে ফিরে যান। [দ্রঃ M.A.Khan, p. 35; অমলেন্দু দে পৃষ্ঠা ৭৫]

১৮৪৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর আলাউদ্দিন প্রতিশোধ নিতে ডানলোপ সাহেবের কুঠির আক্রমণ করেন। পরে সেই গোমস্তাকে বাখরগঞ্জ এলাকায় অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করা হয় এবং তাদের ২৬ হাজার টাকার ক্ষতি করে দেওয়া হয়। অধ্যাপক অমলেন্দু দে’র ভাষায়- “তাঁদের তুলনায় ডানলপের ক্ষতির পরিমাণ অল্পই ছিল।“ [দ্রঃ অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা ৭৫]

সেই সময়কার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন দানলপের বন্ধু। সেই সুবাদে অনায়াসে ডানলপ কোর্টে কেস করলেন। আলাউদ্দিন এবং ৬৩ জন মুসলমান বিপ্লবীকে বন্দী করে বিচার চলতে থাকে। বিচার সকলের শাস্তির রায় হয়। সেই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতার সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করা হয়। চতুর ইংরেজ অবস্থা বুঝে সকলকেই মুক্তি দেয়। ১৮৪৭ সালে মুক্তি পেয়ে আলাউদ্দিন সারা ভারতে প্রত্যক কেন্দ্রে সংবাদ পাঠান যে, চারিদিক হতে এক সঙ্গে ইংরেজ-ধ্বংস অভিযান চালাতে পারলে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হবে। গোপনে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, সারা ভারতের আন্দোলন ও বিপ্লবকে ইংরেজ তার সৈন্য বাহিনী দিয়েই দমন করছে, সুতরাং সৈন্যদের কোন প্রকারে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভয়াবহ রুপ নেবার পূর্বেই সরকার টের পায় যে, নেতা আলাউদ্দিনকে জেলে দেওয়া ছাড়া পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। তাই তাঁকে বন্দি করে জেলে খুব অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের ইন্ধন করা হয়। শরীর দুর্বল এবং অসুস্থ থাকলেও মন আর মস্তিস্ক কিন্তু দুর্বল হয়নি একটুও। তাঁকে ছাড়া হয়েছিল ১৮৬০ সালে। শুধু ভয় করেই এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই যে ইংরেজ সরকার তাঁকে বন্দি করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। [M.A.Khan, p.42-43]

অনেকে মনে করেন, এই রকম এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীনচেতা নেতা যদি স্বাধীনভাবে ছাড়া থাকতেন তাহলে বিপ্লপবের রূপরেখার প্রভুত পরিবর্তন হত; আর সেই জন্যই ইংরেজ তাকে বন্দি করে প্রায় পাঁচ বছর আটক রাখে। দু’বছর তিনি জেলের বাইরে বেঁচে থাকলেও জেলের অত্যাচারের জের টানতে হয়েছিল শেষ জীবন পর্যন্ত। ১৮৬২ সালের ২৪শে অক্টোবর স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী মাওলানা আলাউদ্দিন বাংলারই মাটিতে চিরনিদ্রিত হন। আজকের নিষ্ঠুর ইতিহাস যেন ভুলে গেছে সেই বিপ্লবীর কথা।

আলাউদ্দিনের পুত্রদ্বয়ঃ আলাউদ্দিন সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য পুত্র গিয়াসুদ্দিন হায়দার সামরিক নেতা হিসাবে বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তাছাড়া তাঁর আর এক ভাই আব্দুল গফুরও পুরোপুরি ভাবে বিপ্লব ও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। এই ইতিহাস বিখ্যাত আব্দুল গফুর নামটাকে ইংরেজ ও তাদের অনুসারীরা তার অখ্যাত নাম ‘নোয়ামিঞা’ বলে উল্লেখ করেছেন। নবীনচন্দ্র সেন তার আত্মজীবনী ‘আমার জীবনী’ গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে গফুর সাহেবের জন্য অত্যন্ত বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গ করে যা লিখেছেন তাতে ভারতবাসীর ঘৃণায় মাথা নিচু হয়ে যাবার কথা। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে তা হলো, এরা বংশানুক্রমিক ভাবে

ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে পার্থিব ধ্বংসকে বরণ করে নিয়েছিলেন। এর দ্বারা তাঁদের দেশপ্রীতি ও তেজোদ্দিপ্ত বিপ্লবী মনোভাবের পরিচই পাওয়া যায়। সেই আব্দুল গফুর, গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতি নিঃস্বার্থ বিপ্লবীদের আজকের ইতিহাস কতটুকু ধরে রেখেছ? [দ্রঃ অমলেন্দু দে পৃষ্ঠা ৮২]

স্খলন
মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

খামোশ খামোশ-থামারে তোর অভিযান, নগ্নভাবে রাস্তা চলা সভ্যতারই অপমান। সভ্যতার এই যৌবন কালে
এমন সাহস কোথায় পেলে
অঙ্গ নিয়ে রঙ্গ খেলা ঠাট দেখানোর অভ্যুত্থান!
ভালবাসার নামে এবার উলঙ্গ-উচ্ছাস রাস্তা-ঘাটে কেনা-বেচা নেই কি সরম লাজ। মোরগ মুরগীর ভাব সেজে
যখন তখন প্রণয় খোঁজে

একটা ছেড়ে আরেকটা ধরে হাট বাজারে জয়োল্লাস।
পর্দা ছেড়ে পসারিনীর রাস্তা-ঘাটে চলা চল স্বামীর সাথে স্বামীর বন্ধু ছুরৎ দেখে হয় পাগল।
পশুর স্বভাব অন্তরে
শেষে মারে বন্ধুরে, বন্ধন হারা বন্ধু সুলভ মুখোশ পরা ছলাকলা।।
নীতি ছাড়া পিরিত করে পিরিত রসে ভরায় মন স্বামীর ঘরে তালা এঁটে বাইরে খোঁজে প্রমিক ধন।
বেহায়া যত বাড়ছে দিন
সভ্য যুগের বাড়ছে দিন সভ্য যুগের এই কি চিন যুগের মাথায় হাড়ি ভেঙ্গে নতুনত্বের স্বাধ ভজন।
কি অপুর্ব যুগের দাবী আধুনিকের অসৎ বড়াই গতি হারা প্রগতিতে সভ্যতারে করছে মাড়াই। আর কতরে এবার দাঁড়া আর কতরে এবার দাঁড়া জাত ডুবালি জীবের সেরা

তোদের চেয়ে পশু ভাল করিস না আর বৃথা বড়াই।।

সত্যের সন্ধানে

ইসাবেলা

মূলঃ মাওলানা আব্দুল হালীম শরর লখনভী
অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ইসাবেলার এই কথায় উপস্থিত খৃস্টানগণের উপর যেন বজ্রাঘাত পতিত হল। সকলে একে অন্যের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগল। কিছুক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় থাকার পর অধ্যাপক মীখাইল দন্ডায়মান হলেন এবং সভাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা শুরু করলেনঃ

ভাইসব! আমরা এখানে নিজ নিজ ঈমান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি। আর নিঃসন্দেহে এতা একটি পবিত্র কাজ। কিন্তু এ কাজে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন সত্যকে গ্রহণ করার আগ্রহ এবং নিষ্ঠা পরিপূর্ণ হৃদয়। ঈমান এমনই একটি বিষয় শুধু যা খোদাওয়ান্দের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত মানুষ শুধু তাঁর নিজ চেষ্টায় অর্জন করতে পারে না। অতএব আসুন, আপনারা এবং আমরা সকলে মিলে

খোদাওন্দের দরবারে মিনতি সহকারে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমাদের উপর আজকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ব উদঘটিত করে দিন এবং খৃষ্ট ধর্মের গুপ্তভেদ আমাদের বুঝিয়ে দিন। (সমবেত খৃষ্টানদের তরফ থেকে উচ্চঃস্বরে আওয়াজ উত্থিত হল, আমীন!) মহোদয়গণ! শরয়ীত অভিশাপ কিনা তা একটি বেহুদা প্রশ্ন। আসল কথা হলো, খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব ও মূল বিশ্বাসের জ্ঞান আমাদের মুসলিম ভাইগণের নেই। কাজেই তারা অমূলক প্রশ্ন করে থাকেন। আমাদের ধর্মের সারাংশ শুধু দুইটি কথার দ্বারাই প্রকাশ হয়। খোদাওন্দ যীশুর খোদায়ীত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত। এই দুইটি কথা যে ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম হয়েছে, গোটা খৃষ্ট ধর্মের সম্পূর্ণ গুপ্তভেদই সে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। পিতাজী খোদাওন্দের এটা কতবড় অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে প্রেরণ করেছেন, যিনি জগতে আগমন করে কেবল আমাদেরই জন্য কত যাতনা সহ্য করেছেন। এমনকি ক্রুশ মৃত্যু বরণ করে আমাদের পাপসমূহের প্রাশ্চিত্ত করে গেছেন। কাজেই আমি আমার বন্ধু ওমর লাহমী এবং তার সঙ্গীদের পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন, কাজেই আমি আমার বন্ধু ওমর লাহমী এবং তাঁর সঙ্গীদের নিকট এই দরখাস্তই করব যে, আপনারা শরীয়ত এবং অভিশাপের নিরর্থক

আলোচনা পরিত্যাগ করে খোদাওন্দ যীশুর পবিত্র অস্তিত্ব এবং এর অভুতপূর্ব প্রায়শ্চিত্তের গভীরে চিন্তা করুন এবং খৃষ্টধর্মের উপর ঈমান স্থাপন করুন।

ওমরঃ আমরা এখানে খোশ-আলাপের উদ্দেশ্য আগমন করিনি। আমরা একটি নীতিমালার অধীনে নিয়মতান্ত্রিক আলোচনা করতে ইচ্ছুক। আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় চিঠির মাধ্যমে পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যার সাক্ষ্য আমাদের বোন ইসাবেলা স্বয়ং। এখন আপনারা চাচ্ছেন যে, আমি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় পরিত্যাগ করে যীশুর খোদায়িত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করি। বেশ, আমি এর জন্যও প্রস্তুত আছি, তবে এই শর্তের উপর যে, আপনাকে লিখে দিতে হবে, “শরীয়তের আলোচনা পরিত্যাগ করে শুধু যীশুর খোদায়িত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।”

পিটার্সঃ আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে আপনি আলোচনা না করুন; বরং আমার বলার উদ্দেশ্য হল, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন পরিত্যাগ পুর্বক মৌলিক বিষয়ের উপর চিন্তা করুন।

ওমরঃ তা হলে আপনারা আমাদেরকে এখানে কেন ডেকেছেন? চিন্তা করার জন্য তো গীর্জা অথবা মসজিদের কোন প্রয়োজন নেই। যদি আপনারা আলোচনা করতে অসম্মত হন, তবে

পরিষ্কারভাবে তা জ্ঞাপন করুন, যেন সময়ের অপব্যয় থেকে আমরা রক্ষা পাই।

মীখাইলঃ মহামান্য পিটার্সের কথায় আপনার অন্তরে একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই সম্পর্কীয় আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হোক, বরং উদ্দেশ্য হল, আপনি মৌলিক বিষয়ের উপর চিন্তা করে প্রশ্ন করতে পারেন। যা হোক, এখন বেলা দ্বিপ্রহর হয়ে গিয়েছে আপনাদের আহার করতে হবে। অতএব বলুন, পুনরায় কোনদিন আপনাদের শুভাগমণ হবে?

ওমরঃ এখনই ত সর্বোত্তম সময়। কে বলএ পারে ভবিষ্যতে এমন শুভযোগ আর ঘটবে কিনা?

মিখাইলঃ আপনাদের ত নামাযও পড়তে হবে?

ওমরঃ নামায আমরা এই গীর্জায়ই পড়ে নিব। ইসলামে নামযের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত নয়।

পিটার্সঃ আমার মতে আগামী রবিবার পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হোক।

ওমরঃ কিন্তু আমার অভিমত হলো, আলোচনা মুলতবী করা না হোক। হয়ত খোদা আমাদের সবাইকে সত্য সরল পথে পরিচালিত করবেন।

মীখাইলঃ আচ্ছা, তবে অদ্যকার ন্যায় আগামী কল্যও আলোচনা হোক এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সমাপ্ত করা হোক।

ইসাবেলাঃ যদি আগামী কল্যই পুনরায় আলচনা করতে হয়-তবে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নয়

বরং সন্ধ্যা পর্যন্ত তা চলতে দেয়া হোক, যেন একটি সুফল লাভে আমরা সমর্থ হই।

মীখাইলঃ কখনই নয়, আমাদের কি অন্য কোন কাজ নাই?

ইসাবেলাঃ আমার ধারণায় এই কাজের চেয়ে বেশী জরুরী অন্য কোন কাজ হতে পারে না।

মোট কথা, পরদিন সোমবার সকাল হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুনরায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া সাব্যস্ত হল। প্রথম অধিবেশন এই পর্যন্তই সমাপ্ত হল। ওমর লাহমী সমবেত খৃষ্টানগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গিগণসহ গৃহ রওয়ানা হলেন। পাদ্রীগণ এবং ইসাবেলা গীর্জার অভ্যন্তরেই উপবিষ্ট রইলেন।

জনৈক পাদ্রীঃ বড়ই আফসোস যে, আপনারা এই বিধর্মীদের অভিযোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং আমাদের পবিত্র ধর্মকে বিদ্রুপের বস্তুতে পরিগণিত করেছেন। এই বিধর্মীদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা শুধু তাদের সম্মুখে কোরআন খুলে ধরা। মহামান্য পিটার্স তো প্রথমে এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু আফসোস যে, এরা চালাকীর সাহায্যে আত্মরক্ষা করল বং শরীয়তের আলোচনা আকড়িয়ে রইল। আগামী দিনের আলোচনাও যদি অদ্যকার নিয়মে চলতে থাকে তবে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হবে। কারণ তারা যে সকল বিষয়ে অবগত হতে চায়, তা খোদাওন্দের

নিরেট গুপ্ত ভেদ সম্বন্ধীয় ব্যাপার, যা কেবল পাদ্রীগণই তপস্যাবলে উপলব্ধি করতে সক্ষম, অপর কেউ নয়।

মীখাইলঃ আসলে আমাদের আলচনার সূচনাই
গলদ হয়েছে। নতুবা কেবল কুরআন দ্বারাই ওদের জব্দ করা সম্ভব হত। কোরআনে কিন্তু খোদাওন্দ যীশুকে সৃষ্ট এবং জীবিতকারী উল্লেখ করা হয় নি? ঐ কুরআনেই কি তাঁকে রূহুল্লাহ বলা হয় নি?

পিটার্সঃ কিন্তু আগামী দিনের আলোচ্য বিষয়ও তো নির্ধারিত হয়েছে যে, কেবল যীশুর খোদায়িত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হবে। দেখ, আমি ই কুরআনের রাস্তায়ই তাদেরকে অতি সহজ ও সুন্দরভাবে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মীখাইল ওদের কথা বলার সুযোগ করে দিলো।

মীখাইলঃ আপনি অনর্থক আমাকে অপরাধী করবেন না। এই সব আপনারই কৃতকর্ম।

জনৈক পাদ্রীঃ আপোসে ঝগড়াইয় কি লাভ? যদি আগামী কল্য যীশুর খোদায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তবে তখন দেখা যাবে; আমাদের খৃষ্টধর্ম কোন তাসের ঘর নয় যে, হাত লাগালেই ভেঙ্গে পড়বে?

এই সমস্ত আলোচনার-পর সমবেত খৃষ্টানগণ গীর্জা হতে বের হয়ে যায়। ইসাবেলা এবং তার সহচর ও সহপাঠীগণও রাস্তায় বের হয় এবং আলোচনা করতে থাকেঃ

ইসাবেলাঃ দেখলে, মুসলমানদের অগোচরে তো বলা হয় যে, আমাদের সাথে মুকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের নেই অথচ আজ পরস্পর মোকাবেলা হোয়ায় সকলেই ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমার পিতাজী এক বিশেষ প্রয়োজনে উপাসনা সমাপনান্তে গীর্জা হতে বের হয়ে গৃহে চলে গিয়েছেন, কারণ অধ্যাপক মীখাইল ও পীটার্সের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর পিতাজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তা না হলে তিনি এই বিধর্মীদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতেন।

সহচরীঃ আসল কথা হলো, এদের প্রশ্নটি বড় সাংঘাতিক, এমতাবস্থায় তোমার পিতাজী গীর্জায় উপস্থিত থাকলেই বা কি করতে পারতেন?

২য় সহচরীঃ আমার মনে হয়, আমাদের ধর্মীয় আকায়েদ-দৃঢ় বিশ্বাস যোগ্য ধর্মীয় বিষয় এবং এর মূলনীতিসমূহই কাঁচা। নতুবা আমাদের পাদ্রীসাহেবগণকে এরূপ অপদস্থ কেন হতে হল?

ইসাবেলাঃ তওবা, তওবা! তুমিত শুধু একবারের আলোচনায়ই দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছ! স্মরণ রেখ, আমাদের ধর্মীয় আকায়েদ অত্যন্ত মযবুত। কিন্তু ঐ সকল বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন। আগামীকল্য খোদাওন্দের খোদায়িত্ব এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হবে, তখন দেখ ঐ সব বিধর্মীর কি দুর্গতি ঘটে।

আলোচনারত মেয়েরা হাটতে হাটতে এক চৌরাস্তায় গিয়ে পৌছলো এবং সেখান থেকে সকল আপন আপন গৃহাভিমুখে চলে গেল।

''

ধারাবাহিক উপন্যাস

মরণজয়ী মুজাহিদ

মল্লিক আহমদ সরওয়ার

১২

চীফ কমান্ডারের নিকট পোঁছে আলী ও মেজর ফাইয়্যাজ সমস্ত বিবরণ পেশ করল। তাদের পাহাড়সম হিম্মত ও সাহসিকতার দাস্তান শুনে কমান্ডার মুচকী হেসে বললেন , ইসলামের সোনালী যুগের নমুনা পেশ করেছ তোমরা , তোমাদের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম , আল্লাহ্র শোকর , তোনরা সবাই সুস্থ এসেছ।

আঃ করীমের আম্মা এবং ইয়াসীনের বিবি বাচ্চাকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হয়।

কয়েকদিন পর মেজর ফাইয়্যাজ হায়দার মারকাজে ফিরে আসেন-যাতে শহরের নিকটে থেকে গুপ্ত হামলার তদারকী করা যায়।

শীতের মওসুম শেষ হয়ে বসন্তের আগমনী শুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করেছে। এমন সময়ে মুজাহিদদের কাছে সংবাদ পৌছল যে, কাবুল উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, বৈঠকে মুজাহিদদের গুরুত্বপূর্ণ বড় মারকাজ গুলোর উপর প্রচণ্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলী যে মারকাজে এখন অবস্থান করছিল সেটাও এ আক্রমণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ক্যাম্পটি তিন দিক দিয়ে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। শুধু উত্তর দিকে একটি রাস্তা আছে, এ রাস্তাটি দিয়ে বড় বড় প্রাদেশিক শহর ও কাবুলের সাথে মিশেছে। তা মুজাহিদরা এর নাম রেখেছে ট্রাঙ্ক রোড। বেশ কিছুদিন যাবত এ সড়ক মুজাহিদদের দখলে, সরকারী ফৌজ সড়কটি দখল করার জন্য বার বার হামলা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

মুজাহিদদের এ ক্যাম্পটি আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত। ক্যাম্পের মাঝে পাহাড় খুড়ে বড় বড় গুহা তৈরী করা হয়েছে। আহতদের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ড হাসপাতালও রয়েছে এখানে। পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য মসজিদ। গুহার মধ্যে রেডিও ষ্টেশনও আছে। সমস্ত আফগানিস্তানে এ ষ্টেশন থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। রুশী

মুসলমানদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় রুশ ভাষায়। পাহাড়ের উপর বিমান বিধ্বংসী তোপ তাক করে রাখা হয়েছে। ক্যাম্পের এক পার্শ্বে অতিথি মুজাহিদদের জন্যে হোটেলের ব্যবস্থাও রয়েছে নবাগত যুবকদেরকে এখানে ট্রেনিং দেয়া হয়। আবার অন্যান্য প্রদেশ ও ক্যাম্পে এখান থেকে অস্ত্র সরবরাহও করা হয়ে থাকে। এ সব কারএ ক্যাম্পটি অত্যাধিক গুরুত্ব রাখে। এ ক্যাম্পের যুদ্ধবাজ মুজাহিদরা শত্রুর কাছে যমদূত রুপে পরিচিত। এ মারকাজের ব্যাপারে শত্রু পক্ষ অত্যন্ত চিন্তিত। তাই এর উপর আক্রমণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ওরা।

মার্চের প্রথম সপ্তায় সংবাদ পাওয়া গেল যে, দুশমনের সশস্র ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী সহ বিরাট এক কনভয় মারকাজের নিকটবর্তী এক ছাউনীর দিকে এগিয়ে আসছে। শত্রপক্ষের প্রোগ্রাম হল, প্রথমে পোষ্টি দখল করে সেখানে সামরিক সরঞ্জাম জমা করা, পরে সেখান থেকে সরাসরি মারকাজে হামলা করা। বোমারু বীমানগুলো কনভয়ের ওপর দিয়ে উড়তে থাকে। কণভয়ের অগ্রযাত্রা রোধ করতে মুজাহিদরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কনভয়ের পদে পদে বিছানো হয় ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন, গর্ত খনন করা হয় স্থানে স্থানে এবং ওঁৎ পেতে কয়েক জায়গায় কনভয়ের উপর হামলাও করা হয়। এসব পদক্ষেপের কারণে শত্রু পক্ষকে

পদে পদে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়েছে। কনভয় এক সপ্তাহের জায়গায় ছয় সপ্তাহ পর তাদের লক্ষে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। মুজাহিদদের এসব অতর্কিত হামলার প্রত্যকটিতে আলী অংশ গ্রহণ করে। মুজাহিদরা ধারণা করে যে, শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সরঞ্জামের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তারা এখনই আমাদের মারকাজের উপর আক্রমণ করতে সাহসী হবে না। কিন্তু একদিন অতর্কিতভাবে তারা হামলা করে বসল।

দিনটি ছিল এপ্রিল মাসের জুমাবার। এ সময়ে ক্যাম্পের বেশী সংখ্যক মুজাহিদ পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাত করতে পাকিস্তান চলে গিয়েছে। মার্কাকাজে উপস্থিত মুজাহিদদের সংখ্যা বেশী হলে একশ হবে। সকাল বেলা শত্রু পক্ষের বিশটি বোমারু বীমান দেখা গেল, সাথে এক ডজন হেলিকপ্টার। শুরু হল মারকাজের উপর বোমা বর্ষণ এবং মারকাজের তিন দিক থেকে হেলিকপ্টার হতে নেমে আসে কমান্ডো বাহিনী, যাতে কোনদিক হতে মুজাহিদরা সাহায্য না পায়। চতুর্দিক দিয়ে শত্রুপক্ষ বিরাট শক্তি ও বিশাল বাহিনি নিয়ে প্রচন্ড আক্রমণ করে। অল্পক্ষণের মধ্যে তারা মুজাহিদ ক্যাম্প সংলগ্ন পাহাড় দখল করে নেয়।

ক্যাম্পে উপস্থিত সব মুজাহিদ একত্র হন। তারা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেন, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবেন। তখনই মুজাহিদদের এন্ট্রি এয়ার ক্রাপট গুলো সরব হয়ে উঠে। শত্রু বিমানের উপর শুরু হয় একের পর এক ফায়ার।

কিন্তু শত্রু বিমান তোপের রেঞ্জের বাইরে থাকায় কাজ হচ্ছে না। ওপর থেকে তারা হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা ছুড়ছিলো। তা দেখে মনে হয়, বিমানের পেট ফুঁড়ে বুঝি আরেক বিমান বের হয়ে আসছে। বোমায় মুজাহিদদের এয়ার ক্রাপ্ট গান একটা একটা করে ধ্বংস হয়ে যায়। ক্যাম্পের কয়েক স্থানে নাপাম বোমার বিষ্ফোরণের আগুন ধরে যায়।

বোমাবর্ষণে থেকে বাচার জন্যে মুজাহিদরা পাহাড় খোদিত এক গুহায় আশ্রয় নেয়। মুজাহিদ সংখ্যা এখন মোট ৭০জন। হঠাৎ গুহার উপর বিরাট এক বোমা আঘাত হানে, তাতে ৪৫ জন মুজাহিদ চাপা পড়ে শাহাদাত বরণ করেন। গুহার মুখ বুন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাকীরা গুহার ভিতরে আটকা পড়ে যান।

গুহায় আটকা পড়া মুজাহিদদের মধ্যে আলীও একজন। বদ্ধ গুহায় অতিরিক্ত ক’ঘন্টা তারা জীবিত থাকবে তা বলা মুস্কিল ছিলো। আর এমন প্রচণ্ড বোমা বর্ষনের মাঝে বাইরের কোন সাহায্যেরও আশা করা যায় না। বাহির থেকে সাহায্য আসলেও গুহা মুখে জমা কয়েক হাজার টন মাটি সরাতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন।

ততক্ষণে অক্সিজেনের অভাবে গুহাবস্থিত মুজাহিদরা কেউ বেঁচে থাকবে না। আলী এসব ভাবছিলো। অন্যরাও বসে বসে এ ভাবনায় ছিলো। বদ্ধ গুহার গাড় অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

এভাবে দু’ঘন্টা কেটে যায়। মুজাহিদদের শ্বাস কষ্ট অনুভব হচ্ছে। চীফ কমান্ডারও বোমার আঘাতে আহত। তিনি সব মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে বল্লেন, ‘মুজাহিদ ভায়েরা আমার! আমাদের আগে যারা শাহাদাত বরণ করলেন, আমরাও ক্ষণিক পর হয়ত একে একে সবাই তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। তবে ভয়ের কিছু নেই। কারণ তারা যেমন আল্লাহ্র জন্যে জীবন বিলিয়েছেন, ঠিক তেমনি আমরাও তাদের পথে জীবন দিব। রব্বে যুলজালাল ঘোষণা দিয়েছেন, “এবং যারা খোদার পথে জিহাদ করে এবং নিহত (শহীদ) হয় অথবা মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ্ পাক তাদের উত্তম রিযিক দান করবেন এবং নিশ্চিয়ই আল্লাহ্ পাক একমাত্র উত্তম রিযিকদাতা। তাদের তিনি এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যার উপর তারা সন্তুষ্ট। (সূরা হজ্জ)

তারপর কমান্ডার সাহেব বল্লেন, আল্লাহ্র দরবারে আমাদের প্রতিদান জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহপাক অবগত যে, আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ-নিখাদ। আমাদের কারো মনে পার্থিব সম্পদের লালসা নেই। দ্বীন ইসলাম এর জন্যই শুধু আমরা

জিহাদে ঝাপিয়ে পড়েছি, জালিমের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি। আমাদের সাথীদের মৃত্যু আল্লাহ্র নিকট সম্ভবত এইভাবে কাম্য ছিল এবং আমরাও হয়ত তাদেরই মত শাহাদত বরণ করতে যাচ্ছি। আমাদের সবার হৃদয়ে একই আকাঙ্ক্ষা, একই আশা, স্বদেশকে আমরা মুক্ত-স্বাধীন করব। আবার আফগানিস্তানের আকাশে উড্ডীন হবে ইসলামী ঝান্ডা। আর যে সব শহীদ আমাদের পূর্ব আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছেছেন তাদেরও কামনা ছিল এটাই। বন্ধুরা! এসো সবাই মিলে আল্লাহ্র দরবারে একবার দুআ’ করি, যেন তিনি আমাদের গুনাহ মাফ করেন। কবুল করেন আমাদের এই শাহাদাত। আমাদের দেশ যেন আবার হয় মুক্ত-স্বাধীন। সব মুজাহিদ বল্লেন, ‘আমীন’

কিছুক্ষণ পর্যন্ত মজলিস নবীর। এরপর একদিক হতে আলীর কণ্ঠ শুনা যায়ঃ ‘শ্রদ্ধেয় কমান্ডার সাহেব! শাহাদাত আমাদের একান্ত কাম্য, শাহাদাত লাভ গৌরবের বিষয়, মৃত্যুকে ভয় করি না আমরা। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এ কারণে যে, আমরা অসহায়ের মত মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছি। আমরা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি নে কেন। যিনি সর্বময় ক্ষমতাবান। তিনি আমাদের সাহয্য ফেরেস্তাও পাঠাতে পারেন। বদর ময়দানে আল্লাহ্ পাক কি ফেরেস্তা দিয়ে মুজাহিদদের সাহায্য করেন নি। আর আবরাহার হস্তী বাজিনীকে আবাবীল পাখী দ্বারা ধ্বংস

করেননি? তবে কেন আমরা সেই রাব্বে জুলজালালের দয়া থেকে নিরাশ হচ্ছি ?

আলী কথা শেষ করতেই মুজাহিদ কমাণ্ডারের কণ্ঠ শুনা যায়। ‘বন্ধুগণ ! আলী ঠিকই বলেছে। সত্যিই আমাদের বাঁচার জন্যে বাহ্যিক কোন উপকরণ দেখছিনা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস , আল্লাহ্ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হযরত ইউনুস (আঃ) সমুদ্রে নিক্ষেপিত হয়ে মাছের উদরে গেলে তিনি আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন কি মাছ তাকে তীরে রেখে দেয়নি ? আর হ্যাঁ , আমার আরও স্মরণ আসছে , নবীজি () বনী ইসরাইলের তিনজন ঈমানদার লোকের ব্যাপারেও এরূপ ঘটনা বর্ননা করেছেন। তারা পাহাড়ের গুহায় আটকা পড়েছিলেন। ঘটনার বিবরণ অনেকটা এরূপঃ

বনী ইসরাইলের তিন ব্যক্তি ভ্রমণে বের হয়। তারা কোন এক জায়গায় পৌছলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। এমন সময় প্রবল বর্ষা শুরু হয়। প্রচণ্ড ঝড় বইতেছে। ঝড় থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরা তিনজন এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির ফলে পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে পড়লে গুহা মুখ বন্ধ হয়ে পড়ে। ভাবতে থাকে , কিভাবে এ গুহা থেকে বের হওয়া যাবে। তিনজন মিলে সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথরটিকে ধাক্কা দেয়। কিন্তু পাথরটা এত বড় যে, এক ইঞ্চিও সরলনা। এবার তাঁরা ভাবলো যে, আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। একজন বল্লো , ‘আমরা স্ব স্ব নেক আমলের ওছিলা দিয়ে

আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইলে হয়ত আল্লাহ্ পাক আমাদের বাঁচার উপায় করে দিবেন। বাকী দু’জনও তার কথায় সমর্থন জানায়।

এরপর তাদের একজন মিনতিভরে দু’আ করলো, হে আল্লাহ্! আমি আমার বৃদ্ধ মাতা পিতার সেবা করতাম একান্ত ভাবে নিষ্ঠার সাথে। তাদের না খাইয়ে আমি আমার বাচ্চাদের কখনও খাওয়াতাম না। আমিও খেতাম না। একদিন আমি জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বহু দূর চলে যাই। ফিরে এসে দেখি, মা-বাবা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাদের জন্যে দুধ জ্বালালাম। এ সময় তাদেরকে জাগানো ঠিক হবে না এবং তাদের পূর্বে অন্য কাউকে দুধ খাওয়ানোও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় দুধ নিয়ে তাদের শিয়রে সারারাত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বলায় আমার পায়ে পড়ে কাদঁতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হল। মা-বাবা জেগে উঠে দুধ পান করলেন। হে আমার মালিক! এসব কিছু যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি তবে এগুহার মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দাও। দু’আ শেষ হতেই পাথরটা গুহা মুখ থেকে অল্প একটু সরে যায়।

এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দু’আ করলো, হে আল্লাহ্! আমার এক অপরূপা চাচাতো বোন ছিল, আমি তাকে সীমাহীন ভালবাসতাম। একবার বদ নিয়তে তার নিকটে গেলাম। কিন্তু সে আমার আহবানে সাড়া দিল না। কারণ সে আমার আহবানে সাড়া দিল না। কারণ সে সতী এবং তোমাকে ভীষণ

ভয় করত। একবার আমাদের দেশে ভীষণ দূভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ যুবতী অভাবের তাড়োনায় মার নিকট সাহায্য চাইতে আসে। আমার কুমতলব আবার জেগে উঠে। তাকে বল্লাম, ‘আমার কাম তৃষ্ণা নিবারণের শর্তে তোমাকে একশ বিশ দীনার দিতে প্রস্তুত আছি।‘ অভাবের তাড়নায় নিরূপায় হয়ে সে তাতে সম্মত হল। কিন্তু আমি তার দিকে অগ্রসর হতেই সে বল্লো, ‘আল্লাহকে ভয় কর। পাপ থেকে বেঁচে থাকো’। এ কথার পর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। প্রবল কামনা সত্ত্বেও অপরাধে লিপ্ত হলাম না। আর দীনার গুলোও তাকে দিয়ে দিলাম। আয় আল্লাহ্! এসব কিছু যদি তোমার ভয় ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে আমাদের এ বিপদ হতে উদ্ধার করো। তার দু’আ শেষ হতেই পাথরটা আরেকটু সরে যায়। কিন্তু এখনও বের হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় জন দু’আ করলো, ‘আয় আমার আল্লাহ্! তুমি অবগত আছ যে, একবার আমি ক’জন শ্রমিক নিয়োগ করি। তাদের সবার পাওনা উসুল করে দেই। কিন্তু একজন আর পাওনা না নিয়েই চলে যায়। আমি তার পাওনা টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে বহু অর্থ আয় করি এবং সে অর্থ দিয়ে কয়েকটি উট, গরু, ছাগল এবং দাস খরিদ করি। বহু দিন পর সে কর্মচারী আমার নিকট এসে তার পাওনা চায়। আমি ওই সমস্ত উট, গরু, ছাগল এবং দাস গুলি তাকে দিয়ে দিলাম। সে স্তম্ভিত হয়ে বল্লো, ওহে আল্লাহ্র বান্দা! আমার সাথে ঠাট্টা

করোনা। তোমার সম্পদ নয়, আমি আমার পাওনা টাকা কয়টা চেয়েছি। তখন আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লাম, ঠাট্টা করছি না তোমার সাথে। এসব সম্পদ তোমার সেই পাওনার লভ্যাংশ। অতপর সে খুশী মনে তার সব সম্পদ নিয়ে চলে যায়। হে আল্লাহ্! এসব যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।‘ তার দু’আ শেষ হতেই পাথর পূর্ণ সরে যায়। তাঁরা তিনজন এভাবে গুহা থেকে বের হয় এবং লাভ করে নতুন জীবন।

এঘটনা বর্ণনার পর মুজাহিদ কমাণ্ডার বল্লেন, ‘বন্ধুরা! এসো আজ আমরাও আল্লাহ্ পাকের নিকট অনুরূপ দু’আ করি। তিনি আমাদের কারো নেক আমলের বদলে এ বিপদ থেকে হয়ত আমাদের উদ্ধার করবেন।

এরপর এক মুজাহিদ দু’আ করলো, ‘হে আল্লাহ্! তুমি জান, আমি কলেজে পড়াকালীন সময়ে একদিন আমাদের গ্রামে কমিউনিস্টরা শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রা দেখতে আমিও গিয়েছিলাম। তাঁরা কমিউনিজমের শ্লোগান দিচ্ছিলো। শোভাযাত্রা এক মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা ইওলাম বিরোধী শ্লোগান দেয়া শুরু করে। কারণ ওই মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পক্ষে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। রাশিয়ায় মুসলমানদের উপর বর্বর কমিউনিস্টদের নিপীড়নের কাহিনী তিনি মানুষদের শুনাতেন। তখন ইমাম সাহেব

মসজিদ থেকে বেরিয়ে ইসলাম বিরোধী শ্লোগানের কঠোর প্রতিবাদ জানান। এতে রুষ্ট হয়ে কমিউনিস্টরা তাকে আঘাতে আঘাতে মেরে ফেলে, মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কুরআন শরীফ ছিড়ে বাথরুমে নিক্ষেপ করে। উপস্থিত ক’জন লোক এর প্রতিবাদ জানিয়ে বল্লো, ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর’। একথা শুনে কমিউনিস্টরা অগ্রসর হয়ে বল্লো, যাও, তোমার আল্লাহকে ডেকে আন’। এই বলে সে বর্বর কমিনিস্টি পবিত্র কুরআনের ছিন্ন পাতায় প্রস্বাব করতে থাকে। এসব দেখে আমার চরম রাগ উঠে। তখনই দৌড় ঘরে যাই এবং বন্দুক এনে ঐ কমিউনিস্ট সহ আরো কয়েকজন নাস্তিককে হত্যা করে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেই। হে আল্লাহ্! এসব কিছু যদি তোমাকে ভালবেসে করে থাকি তাহলে আমাদের মদদ কর’।

সবাই বল্লো, ‘আমীন’ ।

এরপর আরেক মুজাহিদ দু’আ করলো। ‘হে
আমার রব! তুমি জান, আমি ও হামেদ একই সাথে পড়া-লেখা করতাম। সে ছিল আমার বাল্য বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অত্যন্ত গভীর। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সে কমিউনিস্ট হয়ে যায়। আমি তাকে বহুবার বুঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সে তা মানলো না। আমার এসব কথাকে ঠাট্টার মতো উড়িয়ে দেয়। সে কুরআনকে বলতো খৃস্টান রচিত গ্রন্থ। হে আল্লাহ্! তোমার রাসূলের শানে সে অত্যন্ত অশালীন বাক্য উচ্চারণ করত। একদিন সে ক্লাশ্রুমে সবার সামনে

কুরআন ও ইসলাম বিরোধী বক্তৃতা দিতে শুরু করে। আমি প্রথমে তাকে এ সব বলা থেকে বিরত থাকতে বল্লাম। কিন্তু সে উল্টো আমার সাথে ঝগড়া বাঁধায়। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শানে অশালীন বক্তৃতা দানকারী এই মুরতাদকে প্রচণ্ড প্রহার করলাম। যদিও সে এক সময় আমার অতি আপনজন ছিল। এরপর আমি তা নাপাক জিহবাটা কেটে ফেলি। হে আমার মাওলা, এসব কিছু যদি তোমার করুণা পাওয়ার আশায় করে থাকি তবে তুমি আমাদের মদদ কর'।

সব মুজাহিদ বল্লো, 'আমীন'!

এমনিভাবে সব মুজাহিদ পালাক্রমে দু'আ করলেন। সবশেষে কমান্ডার সাহেব দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি জান, এদেশে রুশ আহিনীর জবর দখলের পর থেকে আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর নিপীড়ন চলছে। গ্রামের পর গ্রাম পরিণত হয়েছে বিরাণ ধ্বংস্তুপে। ভেংগে ফেলা হয়েছে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা। আর তোমার নাম স্মরণ করার অপরাধে শহীদ করা হয়েছে মুমিন বান্দাদেরকে। এসব কিছু আমি সইতে পারলাম না। তাই তোমার পথে অস্ত্র তুলে নিলাম। এগুলি যদি তোমার সন্তুষ্টির আশায় করে থাকি তবে আমাদেরকে মদদ কর'।

কমান্ডার সাহেবের দু'আয় মুজাহিদরা আমীন বলতেই বাইরে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হয়। পাহাড় কেঁপে উঠে। বিকট শব্দে মনে হচ্ছিলো, বাইরে যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। শব্দ শুনেই মুজাহিদরা চোখ বন্ধকরে ফেলে।

এবার সবাই চোখ মেলে দেখল, গুহা আলকিত হয়ে উঠেছে। গুহা মুখ উন্মুক্ত। গুহার মুখে জমানো হাজার টন মাটি বহু দূরে ছিটকে পড়েছে। এত জলদী দু’আ কবুল হওয়াতে মুজাহিদরা বিস্মিত হল।

অশ্রু ভেজা নয়ন সবাই মহামহীমের দরবারে সেজদাবনত হয়। ব্যাপারটা হলো, এক ডজন শত্রু ফাইটার পুনরায় এসে ক্যাম্পের উপর প্রচণ্ড বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফাইটার থেকে দু’টি বিরাটকায় বোমা গুহা মুখের স্তুপের উপর বিস্ফোরিত হয়। এতে গুহা মুখে জমে থাকা মাটি ও পাথর বহুদূরে ছিটকে পড়ে। এভাবে আল্লাহ্ পাক শত্রু বিমান দিয়ে স্বীয় বান্দাদের মদদ করে আপন সর্বময় ক্ষমতার এক ঝলক তাঁর বান্দাদের অবলোকন করান।

মুজাহিদরা গুহা থেকে বেরিয়ে হিসেব নিয়ে দেখলেন, তাদের এয়ার ক্রাপ্টগানের সবগুলিই ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ভুমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য তিনটি কামান ঠিকঠিক আছে। আর তিনজন মুজাহিদ সেগুলো দ্বারা ফায়ার করে দুশমনের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রেখেছে। ওদিকে শত্রুর বোমারু বিমান থেকে তাদের উপর অজস্র বোমা নিক্ষেপিত হচ্ছে। কয়েকটা বোমা তাদে একেবারে পাশে এসে বিস্ফোরিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাদের হেফাজত করেছেন। মারকাজের মধ্যে এখনও ত্রিশ জন মুজাহিদ

বেঁচে আছেন। বিশ জন আহত এবং বাকী সবাই শহীদ হয়েছেন।

চীফ কমান্ডারের সামনে এখন দি’টি সমস্যা। প্রথম, আহত এবং শহীদদের লাশ নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা। দ্বিতীয়ত, রেডিও ষ্টেশন ওয়াগনটা কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া। এখন আর মারকাজ হেফাজত করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ করে কমাণ্ডার সাহেব সিন্ধান্ত দিলেন, কয়েকজন মুজাহিদ কামান দাগাতে থাকবে। পাচজন থাকবে আমার সঙ্গে। বাকীরা এক্ষুণি রেডিও ষ্টেশন-গাড়ী এবং আহত ও শহীদদের নিয়ে মারাকাজ থেকে বেরিয়ে পড়বে। এ মারকাজ থেকে কোন কিছু নিরাপদে স্থানান্তর করা সম্ভব মনে হচ্ছিল না। কারণ শত্রু বিমান মুষলধারে বোমাবর্ষণ করে চলছে। আর সবগুলি পথে রুশ কমান্ডো ওঁৎপেতে আছে। তারপরও দু’জন মুজাহিদ রেডিও-ষ্টেশন নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন। বাকীরা আহত ও শহীদদের পিকআপে তুল্লেন। এরপর আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ধীরে ধীরে রওয়ানা হলেন। তারা মারকাজ থেকে বেরুতেই শত্রু বিমান এসে তাদের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। কিন্তু ড্রাইভার অত্যন্ত দক্ষ হাতে গাড়ী পার করে নেন। রাস্তায় তারা রুশ কমান্ডোদের অগণিত মৃত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। ওরা বিমান থেকে মাটিতে নামতেই অন্য এক গ্রুপ মুজাহিদ ওদের হত্যা করে। ঐ

গ্রুপ এখনও রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু মারকাজের চীফ কমাণ্ডার সে খবর জানেন না।

****

144